বিদ্যাসাগর



ভট্টাচার্য্য গ্রন্থ সভা



তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ১

বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ডিরেক্টার বাহাদুর কর্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য নির্দ্ধারিত (কলিকাতা গেজেট, ২৭শে নবেম্বর, ১৯১৮)

বিদ্যাসাগর

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৯২১

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিদ্যাসাগর

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

দেবতা আর মানুষে প্রভেদ এই যে, দেবতা গুণময় আর মানুষ—দোষের রাশি। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করলে যে দেবতার সমান হতে পারে, তার প্রমাণ—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সামান্য মানুষ হ'য়ে জন্মেও—নিজের গুণে—দেবতার মত ভক্তি সম্মান লাভ করেছেন, অনেকে তাঁকে 'নর-দেবতা' জ্ঞানে পূজা করেন।

মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম—'বীরসিংহ', সেই বীরসিংহ গ্রামে এক ঘর গরীব ব্রাহ্মণ বাস করতেন। গরীব হলেও তাঁরা বড় ধার্ম্মিক ও আচারসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণের যা কিছু পূজা-অর্চ্চা ব্রত-নিয়ম করা উচিত—সে সকলই করতেন। শুধু তাই নয়—ভিখারীকে দান, আতুরের সেবা, অতিথির সৎকার এসকল তাঁদের নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। তাঁদের দোরে এসে দুঃখী, অতিথ, ভিখারী কেউ কখনো নিরাশ হয়ে ফিরতো না। তাঁরা অতি গরীব—রোজ দুবেলা দিন চলা ভার—তবু নিজেদের যা কিছু জুটতো, তাই থেকে ভিখিরি অতিথকে খাইয়ে তবে নিজেরা খেতেন।

সেই বাড়ীর কর্ত্তার নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়—উপাধি—তর্কভূষণ। তর্কভূষণ মহাশয়ের পৈত্রিক বাড়ী হুগলী জেলার বনমালীপুর

গ্রামে, তাঁর পিতার নাম ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁরা পাঁচ ভাই—তিনি তৃতীয় (সেজো)। বাপের মৃত্যুর, কিছুদিন পরে পাঁচ ভাইয়ে আর বনিবনাও রইলো না—নিত্য ঝগড়া, নিত্য কচ্‌কচি আরম্ভ হ'ল। এই সব কারণে তর্কভূষণ মহাশয়ের মনে সংসারের উপর বিরাগ জন্মাল। শেষে যখন বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হ'ল তখন তিনি আর সে অশান্তি সহ্য করতে পারলেন না, মনের ঘৃণায়—সংসার ত্যাগ ক'রে ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কোথায় গেলেন তার সন্ধান পাওয়া গেল না, সকলেই বুঝলে রামজয় ঠাকুর ইহকালের মত সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে গেছেন।

তখন তাঁর স্ত্রী—দুর্গাদেবী বড় বিপদে পড়লেন। তাঁর দুটি ছেলে, চারটি মেয়ে, ভাসুর দেওরেরা কেউ ফিরেও চান না, মলেও জিজ্ঞাসা করেন না। এতগুলি অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে নিয়ে কি ক'রে দিনপাত করবেন ভেবে আকুল হলেন। একলা মেয়েমানুষ তিনি—সহায় সম্বল হীনা—একটা কথা ডেকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোকটি নেই, কি উপায় করবেন? তিনি তখন সেই অকূলের কাণ্ডারী, বিপদ্‌হারী মধুসূদনকে ডাকতে লাগলেন। সংসারে যার কেউ নেই—তার সহায় ভগবান, সেই অনাথের নাথ এই অনাথার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন।

দুর্গাদেবীর বাপের বাড়ী—মেদিনীপুর জেলার 'বীরসিংহ' গ্রামে। তাঁর বাপ—উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত বিখ্যাত পণ্ডিত, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁর জোড়া পণ্ডিত আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি দুর্গাদেবীর দুঃখ কষ্টের কথা শুনে মনে বড় কষ্ট পেলেন এবং মেয়ে আর নাতি-নাত্‌নীগুলিকে বনমালীপুর থেকে আনিয়ে বীরসিংহে নিজের বাড়ীতেই রাখলেন। সেই থেকে দুর্গাদেবীর শ্বশুরবাড়ী বনমালীপুরের বাড়ী ঘরের অংশ—আপনার বলবার যা কিছু ছিল—সব অমনি শূন্য হ'য়ে পড়ে রইল।

যারা জলে পড়ে স্রোতের মুখে ভেসে যায়, তারা যেমন সাম্‌নে একটা কাঠ-কুটো দেখলে প্রাণের দায়ে জড়িয়ে ধরে আশ্রয় করে, দুর্গাদেবীও তেমনি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে বাপের বাড়ীর আশ্রয়ে এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, ছেলেমেয়েগুলিকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবার ভাবনা আর তেমন রইল না, কিন্তু একটা ভাবনা, একটা দুঃখ, একটা অভাব প্রাণের ভিতরে দিবারাত্রি শেলের মত বিঁধতে লাগলো, সেটি—পতির অদর্শন! তিনি স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য অহোরহঃ ঠাকুর দেবতার চরণে মাথা খুঁড়তে লাগলেন, ভগবানের উপর বিশ্বাস ভক্তি রেখে প্রাণ ভ'রে কেবল ডাকতে লাগলেন। এই রকমে দিন কতক কাট্‌লো।

কিন্তু সে ভাবেও তিনি বেশী দিন সেখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারলেন না। মানুষের যখন দুঃখের দিন আসে, তখন একটার পর একটা করে নানাবিপদ চারিদিক থেকে এসে একেবারে ছেয়ে ফেলে। দুর্গাদেবীর অদৃষ্টেও তাই ঘট্‌লো।

ছয়টি অপোগণ্ড ছেলে মেয়ে নিয়ে নিরুপায় অনাথা ননদ যে উড়ে এসে জুড়ে বসে চিরকাল অন্ন ধ্বংস করবে, এটা ভাজের প্রাণে সইলো না। প্রথম প্রথম দিনকতক স'য়ে থেকে শেষে তিনি সামান্য খুঁটিনাটি ধরে ঝগড়া বিবাদ সুরু কল্লেন। দুর্গাদেবীর কোন দোষ কোন ত্রুটি না থাকলেও তিনি মনে মনে বুঝলেন যে বাপ-মা বেঁচে থাকতেই যখন ভাজ এই রকম সুরু করেছেন, তখন ভাই কখনই অনাথা বোনটিকে আর তার ছেলেমেয়েদের চিরদিন পুষ্‌বে না। কিন্তু তাঁর আর স্থান কোথায়—যাবার জায়গা কোথায় আছে? কাযেই বাধ্য হয়ে তিনি চুপটি করে মুখ বুজে সকল সইতে লাগ্‌লেন, কিন্তু মনের দুঃখ তাঁর চোখে শ্রাবণের ধারা সৃষ্টি করলে।

বাপ-মা অত্যন্ত বুড়ো হয়ে ছেলে আর বৌয়ের অধীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদের আর কোন ক্ষমতা নেই—সংসারে কোন কথা চলে না, ছেলে-বৌ কর্ত্তা-গিন্নি—যা করে, তাই হয়, সুতরাং দুর্গাদেবীর চোখের জল ছাড়া আর কিছু সম্বল রইলো না। এই রকমে দিন কতক গেল, কিন্তু শেষে এমন হল যে বাপের বাড়ীতে আর এক বেলা তিষ্ঠানোও দুর্গাদেবীর ভার হ'ল।

মায়ের পেটের ভাই—সহোদর—তিনিই যখন বোনের দুঃখ কষ্ট বুঝলেন না, তখন বৌ ত পরের মেয়ে—তার দরদ হবে কেন, দুর্গাদেবী আর তাঁর ছেলেমেয়েদের অপমান, দুর্গতি ও লাঞ্ছনার একশেষ হ'তে লাগ্লো। বুড়ো বাপ-মা মেয়ের দুঃখে দিন রাত চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলেন, উপযুক্ত বৌ-বেটা তাঁদের কথা গ্রাহ্যই করে না, তাঁরা আর কি ক'রবেন? মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও চোখের জল সার হ'ল। শেষে আর সহ্য ক'রতে না পেরে তাঁরা এক যুক্তি স্থির করলেন।

তাঁদের বাড়ীর কাছেই সামান্য একটুখানি জায়গাতে মেয়ের বসবাসের জন্য একখানি কুঁড়ে বেঁধে দিলেন। দুর্গাদেবী বাপের বাড়ী ছেড়ে সেই কুঁড়েতে এসে ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বাধীন ভাবে বাস করতে লাগলেন।

এখনকার দিন হ'লে ভাই-ভাজ সেটুকুও করতে দিতেন না। সেকালে দূর পল্লীগ্রামে একটুখানি প'ড়ো জায়গার কিছুই দাম ছিল না, তাই তাঁরা আর বাধা দিলেন না—বিশেষতঃ বুড়ো বাপ-মার নিতান্ত জিদ। দুর্গাদেবী নিজের ভেবে সেই কুঁড়েখানিতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুঃখের সংসার

কথায় বলে—'খাই না খাই, মাথা গুঁজে থাকতে পেলে বাঁচি।' দুর্গাদেবীরও তাই হ'ল। যত দুঃখ যত কষ্টই হোক, এতদিন পরে তিনি যে আপনার বলবার একটু স্থান পেলেন তাইতেই পরম সুখী হলেন। এখানে কেউ তাঁকে বকবার নেই, গঞ্জনা দেবার নেই, অপমান করবার নেই, তাঁর ছেলেমেয়েগুলি এখানে কারো চক্ষুশূল হবে না, বিনা কারণে বাছাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হবে না, তিনি দুঃখী বলে কারো বিষ-দৃষ্টিতে পড়বেন না—এই তাঁর পরম সুখ। ভগবান যাকে অনাথ আশ্রয়হীন করেছেন—এই টুকুই সে পরম সৌভাগ্য মনে ক'র্‌লে।

পশুপাখীও তো খেতে পায়, গরীব ভিখারীরও তো দিনপাত হয়, পথের কুকুর বিড়ালের বাচ্ছারাও তো বেঁচে থাকে—তাঁরও তেমনি করে চলবে, দীনের আশ্রয় দীননাথ দিন চালিয়ে দেবেন, তবে আর ভয়-ভাবনা কি? অনাথিনী সাহসে বুক বাঁধলে। ভগবানের উপর নির্ভর করে দুর্গাদেবী ছেলেমেয়েগুলিকে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

সেকালে চরকায় সূতা কাটা গৃহস্থ পরিবারের একটা কায ছিল। অনেক গরীব ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা এবং ব্রাহ্মণের উপায়-হীন বিধবারা এই রকম করে চরকায় সূতা কেটে অন্য লোক দিয়ে হাটে বাজারে বেচতে পাঠাতেন। তাতে তেমন কিছু বেশী উপার্জ্জন হ'ত না বটে, তবু ভিক্ষার চেয়ে ভাল ভেবে গরীব দুঃখীরা তাই করতেন। তাতে সেকালে অতি দীনভাবে কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে চলতে পারতো। দুর্গাদেবীও আর অন্য কোন রকম উপায় দেখতে না পেয়ে সেই কায করতে আরম্ভ করলেন।

তিনি যদি একলা হতেন তা'হলেও বা এ উপায়ে অতি কষ্টে কোন রকমে তাঁর একটা পেট চলতে পা'রত, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাঁর খাওয়াতে পরাতে অনেকগুলি। ছেলেমেয়ে ছয়টি তা ছাড়া নিজে—সর্ব্বশুদ্ধ এই সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণ এ উপায়ে কিছুতেই হতে পারে না। তাঁদের কষ্টের আর পরিসীমা রইলো না। কি করবেন, আরতো কোনদিকে কোন উপায়ও নেই, তিনি দিন রাত্রি ভগবানের চরণে আপনার দুঃখ নিবেদন করতে লাগলেন।

মেয়ে যে এতগুলি শিশু সন্তান নিয়ে কি দুঃখ কষ্ট পাচ্ছেন, বাপ মা তা জানতেন, এবং সময়ে সময়ে বৌ বেটাকে লুকিয়ে কিছু কিছু সাহায্য করতেন। কিন্তু তাতেই বা কি হবে? তপ্ত বালির উপরে দু'একফোঁটা জল দিলে তা যেমন তখনি শুষে নেয়—চিহ্নমাত্রও থাকে না, সে সাহায্যও দুর্গাদেবীর সংসারে তেমনি হ'ত। তাঁদের দুঃখ কষ্ট কিছুতেই ঘুচলো না।

শ্বশুরবাড়ীতে দুঃখজ্বালা এবং বাপের বাড়ীতে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করে দুর্গাদেবী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অদৃষ্টে যাই ঘটুক, দুঃখ কষ্ট যতই বাড়ুক, তিনি আর কখনো পরের দ্বারস্থ হবেন না। পরের দয়ায় নির্ভর করার চেয়ে—ভিক্ষা করে খাওয়ার চেয়ে, একবেলা খাওয়া ভাল—আধ-পেটা খাওয়া ভাল—উপোস করা ভাল—না খেয়ে মরা ভাল। তাই তিনি অশেষ কষ্ট পেলেও আর কখনো কারো দোরে যেতেন না; নিজের উপর নির্ভর করে, ভগবানের নাম নিয়ে অতি কষ্টে কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলেন।

ছয়টি সন্তান—সবাই ছোট, শক্তিহীন, তাদের না দিয়ে নিজে খেতে পারেন না। যা কিছু জোটে তা 'ছ'জনের দুবেলা পেট

ভরাই হয় না, তিনি নিজে আর কি করে তাতে ভাগ বসাবেন? কাযেই মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন তাঁর উপোসে কাটতো, বাকী অর্দ্ধেক দিনের কোন দিন এক বেলা, কোন দিন আধপেটা, কোন দিন বা একটি ছোলা দাঁতে কেটে জল খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। তবু কারো কাছে একটি দিন একবেলার জন্যও হাত পেতে দাঁড়াতেন না।

শুধু তাই নয়, এই অবস্থায়ও দুর্গাদেবী ধর্ম্ম কর্ম্মে আস্থা-শূন্য হ'ন নি। সংসারীর যা কিছু করা উচিত সেই সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মই তিনি প্রাণপণে করতেন। এই দুঃখ দুর্দ্দশার দিনেও—দ্বারে ভিখারী অতিথি এলে—তিনি কখনও ফিরিয়ে দিতেন না, নিজে উপবাসী থেকে, এমন কি সকল ছেলেদের ভাগ হতে অল্প অল্প নিয়ে তিনি ভিক্ষা দিতেন, অতিথির সৎকার করতেন। এই সকল দেখে গরীব দুঃখীরা তাঁকে 'মা অন্নপূর্ণা, বলে ভাবতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরদাস

দিন থাকে না, কেটে যায়—তা যেমন করেই হোক। দুর্গাদেবীরও দিন অতি কষ্টে কাটতে লাগলো, শেষে এমন হ'ল যে একেবারে অসহ্য—আর চোখে দেখা যায় না। ঠাকুরদাসের বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো বৎসর।

ঠাকুরদাস দুর্গাদেবীর বড় ছেলে, কিন্তু বড় হলে কি হয় তিনিও তো ছেলে মানুষ, চৌদ্দ বছরের ছেলে আর সংসারের কি উপকার করতে পারে? তখন তাঁর লেখাপড়া শেখবার সময়। কিন্তু দুর্গাদেবীর

এমনি পোড়া কপাল যে অমন সোণার চাঁদ ছেলেদের তিরিশ দিন দু'বেলা পেটভরে খাওয়াতেই পারেন না. তা আর ভাল রকম লেখাপড়া শিখাবেন কেমন করে? তবু বালকের লেখাপড়া শেখবার আন্তরিক ইচ্ছা এমন প্রবল, যে একটুমাত্র সুযোগ পেলেই তিনি যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পেতেন।

পাঠশালের মাহিনা দিবার ক্ষমতা নেই, বই কেনবার ক্ষমতা নেই, কালি কলমের সংস্থান নেই, তবু ঠাকুরদাস সেই বয়সেই নিজে চেষ্টা করে সে সব যোগাড় করতে লাগলেন। গাছের তালপাতা পেড়ে, কঞ্চিকেটে কলম করে, এর দোয়াতের কালি নিয়ে, ওর ছেঁড়া বইয়ের পাতা কুড়িয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলেন। যখন যেখানে সুবিধা পেতেন—যখন যার অবসর দেখতেন তখন তার কাছে গিয়ে খোসামুদি করে পড়া বুঝে আসতেন। অনেক সময় লোকের ফাই-ফরমাস খেটেও—তার বদলে—তার কাছ থেকে পড়া শিখে নিতেন। এই রকম করে, গরীবের ঘরের সেই দুখের ছেলে ঠাকুরদাস যৎকিঞ্চিৎ রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখলেন।

লেখাপড়া যতই শিখতে লাগলেন ততই আরো বেশী রকম, ভালরকম শিখবার জন্য তাঁর পিপাসা বাড়তে লাগলো, কিন্তু তা আর মিটাবার উপায় হল না। ক্রমে যখন তাঁর বয়স প্রায় পনেরো, তখন সংসারের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে দুর্গাদেবী আর কিছুতেই সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেন না! মায়ের দুঃখ কষ্ট ছেলের প্রাণে শেলের মত বিঁধতে লাগলো, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—যেমন করে হোক মায়ের দুঃখ দূর করবেন।

ঠাকুরদাসের এক জ্ঞাতির ছেলে সেই সময়ে কলিকাতায় থেকে অর্থোপার্জ্জন করতেন. তাঁর নাম জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার। তিনি তখন

সেখানে বেশ প্রতিপন্ন হ'য়ে গুছিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মতিগতিও ভাল ছিল, সদ্ব্যয় করতেন, দুঃখীকে অন্ন দিতেন, বিপন্নকে সাহায্য করতেন। অনেক লোক তাঁর বাড়ীতে খেয়ে মানুষ হ'ত। ঠাকুরদাস স্থির করলেন যে সেইখানে গিয়ে রোজগারের চেষ্টা করবেন।

দুর্গাদেবী যখন ছেলের মনের কথা শুনলেন, তখন দু'চক্ষু তাঁর জলে ভেসে গেল, একরত্তি দুধের ছেলেকে একলা বিদেশে পাঠিয়ে কেমন করে তিনি প্রাণ ধরে থাকবেন? কিন্তু না পাঠালেও নয়, সংসারের অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছিল, তাতে আর কিছুদিন পরে হয়ত সকলকেই না খেয়ে প্রাণ দিতে হবে। তাঁর প্রাণ যা'ক দুঃখ নেই—মরণই তাঁর সুখ-শান্তির বিষয়, কিন্তু অতগুলি অপোগণ্ড বাছারা না খেতে পেয়ে অনাহারে প্রাণ দেবে, এ কথা মনে করতেও তাঁর প্রাণ আতঙ্কে শিউরে উঠে। তিনি ঠাকুরদাসের মতে মত দিলেন এবং ভগবান স্মরণ করে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অতি কষ্টে বুক বেঁধে ঠাকুরদাসকে বিদায় দিলেন। পনের বছর বয়সে ঠাকুরদাস প্রথম বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় গেলেন। জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার আদর করে ঠাকুরদাসকে আপনার বাড়ীতে রাখলেন।

সে সময়ে এখনকার মত কেউ ইংরাজী জানতো না, সুতরাং মোটামুটি রকম অল্পস্বল্প ইংরাজী শিখতে পারলেই সাহেবদের কুঠীতে চাকরি মিলতো। এইজন্য ঠাকুরদাসকে সকলেই ইংরাজী শিখিবার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু তখন শিখিতে ইচ্ছা করলেও সহজে ইংরাজী শিখবার উপায় ছিল না। প্রথমতঃ বই মিলতো না, দ্বিতীয়তঃ শিখায় কে? ঠাকুরদাস নিরাশ হতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সন্ধান পেলেন যে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের এক বন্ধু সামান্য রকম ইংরাজী জানেন। তাঁর

মনে আশা হ'ল, তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে পীড়াপীড়ি করে ধরলেন, ন্যায়ালঙ্কার মশাই তাঁর বন্ধুকে অনুরোধ করে ঠাকুরদাসের ইংরাজী শিখবার প্রথম বন্দোবস্ত করে দিলেন।

সেই ভদ্রলোক নিজের কায কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে প্রায় সর্ব্বদাই বাইরে বাইরে থাকতেন, সুতরাং প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে তাঁর নিজের বাসায় ঠাকুরদাসের ইংরাজী শিখবার বন্দোবস্ত হ'ল। ঠাকুরদাস আনন্দিত মনে রোজ সন্ধ্যার পর সেইখানে গিয়ে শিখতে লাগলেন। কিন্তু দিনকতক পরে সেটা তাঁর পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে উঠ্‌লো।

জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ীতে যতগুলি উপরি লোক খেতেন, তাঁদের আহার সন্ধ্যার পরেই হ'ত। ঠাকুরদাস যেদিন খাবার জন্য দেরী করে যেতেন সেদিন গিয়ে দেখতেন—সে ভদ্রলোক হয়ত বিশ্রাম করছেন, নয়ত তাড়াতাড়ি যা তা করে সেরে দিয়ে বিশ্রাম করতে উঠে যেতেন। সুতরাং তাতে তাঁর পড়ার বড় ক্ষতি হতে লাগলো, তখন তিনি স্থির করলেন আগে পড়ে এসে তার পরে আহার করবেন। কিন্তু তাতেও এক গোল ঘটলো। সন্ধ্যার পর না খেয়ে পড়তে গিয়ে, রাত্রে ফিরে এসে দেখতেন যে বাড়ীতে উপরি লোকের খাওয়া দাওয়া সব চুকে শেষ হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁর অদৃষ্টে আর আহার জুটতো না। না খান—নেই, তবু তিনি পড়ায় অবহেলা করলেন না, রোজই সন্ধ্যার সময় পড়তে যেতে লাগলেন, সুতরাং রোজই রাত্রি উপবাসে কাটতে লাগলো।

ছেলেমানুষ ঠাকুরদাস প্রত্যহ এ রকম একবেলা আহার করে আর কতদিন সুস্থ থাকতে পারেন, তিনি নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হতে লাগলেন। পড়া অভ্যাস করে ফিরে এসে তিনি যখন দেখতেন যে বাড়ীর খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে অথচ দারুণ ক্ষুধায় তাঁর পেটের ভিতর জ্বালা

করছে, তখন দু'চখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেত, মনে মনে ভগবান স্মরণ করে শুয়ে পড়তেন। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় ঘুম আসতো না, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যাতনায় ছটফট করে শেষে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। এই রকমে তাঁর ইংরাজী শিক্ষা চলতে লাগলো।

এমনি ভাবে দিন যায়, একদিন সেই ভদ্রলোকটি পড়া বলে দিতে দিতে ঠাকুরদাসের মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—"একি ঠাকুরদাস, তোমার কি কোন ব্যামো হয়েছে, তুমি এ রকম হয়ে যাচ্ছ কেন?" ঠাকুরদাস কোন জবাব করতে পারলেন না, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি নীচের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো।

ঠাকুরদাসের এই ভাব দেখে সেই ভদ্রলোকটি বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, তাঁর মনে বড় কৌতূহল হল, পীড়াপীড়ি করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—"কি হয়েছে তোমার বল।"

ঠাকুরদাস তখন এক এক করে রাত্রের অনাহারের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেল্লেন, শুনে ভদ্রলোকটির মনে বড় কষ্ট হ'ল। ভাগবত চরণ সিংহ নামে আর একটি ভদ্রলোক সেদিন সেখানে বসে ছিলেন, সেই জন্যই ঠাকুরদাস কথাটা বলতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিলেন। তিনি ঠাকুরদাসের মনের ব্যথা বুঝলেন, ছেলেমানুষের প্রত্যহ সেই উপবাসের কষ্টের কথা শুনে তাঁর মনে বড় কষ্ট হল এবং বালকের লেখা-পড়া শেখবার আশ্চর্য্য অনুরাগ দেখে তার উপর স্নেহ হল—দয়া হল,—তিনি বল্লেন—

"দেখ ঠাকুরদাস, যে রকম শুনলুম তাতে ওখানে থাকা আর তোমার সুবিধা নয়, তুমি এক কায কর, নিজের হাতে রেঁধে খেতে পারবে কি? তা'হলে তুমি আমার বাসায় গিয়ে থাকবে চল।"

ঠাকুরদাস আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলেন,—তাড়াতাড়ি বল্লেন—"আপনি যদি দয়া করেন, তা হলে আমি রেঁধে খেতে খুব পারবো।"

পরদিনই ঠাকুরদাস ভাগবত বাবুর বাসায় গিয়ে উঠলেন। তাঁর বাসা বড়বাজার অঞ্চলে। সেখানে ভাগবতবাবু বালকের আহারের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিলেন, ঠাকুরদাসও দু'বেলা পেটভরে খাবার যোগাড় পেয়ে মনের আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে ইংরাজী শিখতে লাগলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাকরি

কিন্তু কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়। ভাগবত বাবু দালালির কায করতেন। দিন কতক পরে তাঁর কায কর্ম্ম হঠাৎ এমন মন্দা হয়ে প'ড়লো, যে তাঁর উপার্জ্জন বন্ধ হ'ল, সুতরাং তাঁর নিজের আর ঠাকুরদাসের মহা কষ্ট উপস্থিত হল। একদিন জোটে—ত—পাঁচদিন অনাহারের ভয়।

ভাগবতবাবু সকালে উঠে রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে যান, ঠাকুরদাস তাঁর ফেরবার আশায় পথপানে চেয়ে থাকেন। কিন্তু সকল দিন তিনি রোজগার করে আনতে পারেন না। যেদিন পান, সেদিন দু'জনেরই খাওয়া হয়, কিন্তু যেদিন কিছুই পান না—খালি হাতে ফিরে আসেন—সেদিন দু'জনারই অনাহারে কাটে। ক্রমে এইটেই বেশী ঘটতে লাগলো। ঠাকুরদাসের ভাগ্যে প্রায়ই অনাহার আরম্ভ হল। এক একদিন এমন ঘটতে লাগলো যে ক্ষুধার জ্বালায় তিনি আর বাড়ীতে স্থির

হয়ে থাকতে পারতেন না ; পাগলের মত পথে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সময় কাটিয়ে দিতে বাধ্য হতেন।

ঠাকুরদাস ইচ্ছা করলে, ভাগবত বাবুর বাড়ী ছেড়ে আবার ন্যায়ালঙ্কার মশায়ের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না : ভাগবত বাবু তাঁকে বড় যত্ন আদর ও স্নেহ করতেন, সে কথা তিনি ভুলতে পারলেন না, বিশেষতঃ বালকের মনের বল এত বেশী—যেখান থেকে একবার চলে এসেছেন, সেখানে ফিরে যেতে আর তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না : কাযেই ভাগবত বাবুর সঙ্গে তাঁরও দুঃখ কষ্টের একশেষ আরম্ভ হল।

ঠাকুরদাস যখন কলিকাতায় আসেন, তখন সম্বলের মধ্যে একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট পিতলের ঘটী সঙ্গে এনেছিলেন। যখন প্রায়ই অনাহার ঘটতে আরম্ভ হল তখন তিনি ভাবলেন যে থালা না থাকলে কোন ক্ষতি নেই, এক পয়সার শালপাতা কিনলে তাতে পনের দিন স্বচ্ছন্দে খাওয়া চলতে পারে। থালা বেচে হাতে কিছু পয়সা রাখা ভাল, যেদিন কিছুই জুটবে না, সেদিন আধ পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে কাটাতে পারবেন।

উপোসের কষ্ট সইতে না পেরে একদিন তিনি সেই থালাখানি বেচবার চেষ্টায় বেরুলেন, কিন্তু চোরাই জিনিষ ভেবে কোন কাঁসারি তা কিন্‌লে না। অনাহারে অবসন্ন ঠাকুরদাস নিরাশ হয়ে মরার মত অবস্থায় ঘরে ফিরে এসে ভগবান স্মরণ করে, শুয়ে পড়লেন। পাছে সে কথা শুনলে ভাগবত বাবু মনে কষ্ট পান সেইজন্য তাঁকে থালা বেচ্‌বার কথা বল্‌লেন না।

কিন্তু মানুষ এমন প্রায়ই অনাহারে কাটিয়ে আর কদিন বাঁচতে পারে, কদিন লেখাপড়া শিখতে পারে, কদিন তার মনে আশা উৎসাহ

বল থাকে ? ঠাকুরদাস মনে মনে কেবল জগদীশ্বরকে ডেকে মন বাঁধতে লাগলেন। অন্তর্যামী ভগবান বুঝি বালকের কাতর প্রাণের ডাক শুনলেন !

সেদিন ঠাকুরদাস বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই ক্লান্ত, বড়ই অস্থির হয়ে পড়লেন। আগের দিন দিনের বেলা নামমাত্র জলযোগ এবং রাত্রি অনাহারে কেটেছে। সেদিন দুপর কাটতে চল্লো—তবু আহারের যোগাড় হ'ল না। ক্ষিদের জ্বালায় পাগলের মত হয়ে ঠাকুরদাস ছটফট্ করতে করতে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বাসা—বড় বাজারে, ঘুরতে ঘুরতে ঠনঠনে এসে পড়েছেন। আর পা চলে না, শরীর অবশ—সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করছে, মাথা ঘুরছে, চক্ষে অন্ধকার। ক্ষুধায় পেট টেনে ধরেছে, তৃষ্ণায় জিভ পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। আর উপায় নাই—বুঝি পথের ধারেই পড়ে মরতে হয় !

সেইখানে—ঠাকুরদাসের ঠিক সম্মুখেই একখানি মুড়ি-মুড়কীর দোকান। একজন বিধবা আধাবয়সী মেয়েমানুষ মুড়ি-মুড়কী বেচছিল। ঠাকুরদাস সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে যেন অজ্ঞানের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ মেয়েমানুষটির দৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো। ব্রাহ্মণের ছেলেকে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাও ঠাকুর ? অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?" ঠাকুরদাস একটু খাবার জল চাইলেন। মেয়েমানুষটি তাঁকে আদর করে ডেকে দোকানে বসতে বল্লে এবং একমুঠো মুড়কী আর এক ঘটী জল এনে দিলে।

ঠাকুরদাস মুড়কী ক'টি হাতে পেয়ে পরম আগ্রহে অমৃতের মত জ্ঞান করে খেলেন। মেয়েমানুষটি তাঁকে সে রকম ভাবে মুড়কী ক'টি খেতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা ঠাকুর, তোমার কি খাওয়া হয়নি ?"

ঠাকুরদাস ছল-ছল চক্ষে বল্লেন—"না মা, রাত থেকেই উপোসী রয়েছি।"

শুনে মেয়েমানুষটি তাঁকে জল খেতে মানা করলে এবং তাড়াতাড়ি কাছের এক গোয়ালার দোকান থেকে দই কিনে আনলে। তারপরে ঠাকুরদাসকে দই ও মুড়কী দিয়ে পেটভরে ফলার করালে। ঠাকুরদাসের মরা দেহে যেন আবার নূতন প্রাণ ফিরে এল।

ফলার শেষ হ'লে মেয়েমানুষটি এক এক ক'রে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে ঠাকুরদাসের অবস্থার কথা সমস্ত শুনলে। তখন তার চক্ষুও ব্রাহ্মণের ছেলের দুঃখের কথায় ছল-ছল ক'রতে লাগলো। সে জোর করে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে—যেদিন তাঁর খাওয়া না হবে, সেদিন ঠাকুরদাস এসে সেখানে ফলার ক'রে যাবেন। সেই দিন ঠাকুরদাস ভগবানের করুণা যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন। সেই থেকে—যেদিন না খাওয়া হ'ত—ঠাকুরদাস সেই দোকানে এসে ফলার করে যেতেন। এই রকমে তাঁর ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা চল্লো।

ঠাকুরদাস মায়ের দুঃখ কষ্ট দূর করবার জন্য কলিকাতায় রোজগার ক'রতে এসেছিলেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার কিছুই হ'ল না। বাড়ীর কথা মনে পড়ে ঠাকুরদাস কাতর হ'য়ে উঠতেন, মায়ের আর ভাইবোনদের দুঃখ কষ্টের কথা ভেবে, তাঁর চক্ষু জলে ভরে উঠতো, তিনি দিনরাত ভগবানকে ডাকতেন আর প্রাণপণে ইংরাজী শিখে রোজগার ক'রবার উপযুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। অবশেষে যেটুকু ইংরাজী শিখবার তা শিক্ষা হ'ল, তখন উপার্জ্জনের চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

তিনি তাঁর বাড়ীর অবস্থার কথা ভাগবত বাবুকে বলেছিলেন, এখন তাঁকে যে কোন রকম একটি চাকরি যোগাড় ক'রে দেবার জন্য ধরলেন। ভাগবত বাবুও বুঝলেন যে এ অবস্থায় ঠাকুরদাসের আর

অধিক লেখাপড়া শেখা অসম্ভব, ঠাকুরদাস বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সৎ ও উদ্যমশীল। এই সময় কোন একটা কর্ম্মকায জুটিয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতি ক'রতে পারবে। এই ভেবে তিনি নিজে চেষ্টা করে ঠাকুরদাসকে এক জায়গায় একটি চাকরি যোগাড় ক'রে দিলেন। মাহিনা হ'ল—মাসে দু'টাকা।

তখনকার দিনের দু'টাকা এখনকার কুড়ি টাকায় সমান। তখন আট আনায় একমণ চাউল হ'ত, এক টাকায় একমণ দুধ মিলতো, শাকসবৃজি আনাজ তরকারী প্রায়ই কিনতে হ'ত না। বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের লোক টাকা চোকে দেখতে পেত না— টাকার দরকারও হ'ত না। চাল ডাল নুন তেলের যোগাড় থাকলেই উঠানের আনাজ কোনাজে, প্রতিবাসীর পুকুরের মাছে, জঙ্গলের শুক্‌নো কাঠ কুটোর জ্বালে এক রকমে দিন গুজরাণ হ'ত। সুতরাং দু'টাকা মাইনের চাকরি পেয়েই ঠাকুরদাস আনন্দে আটখানা হলেন, এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভাগবত বাবুর বাসাতে থেকেই অতি কষ্টে স্বষ্টে নিজে দিনপাত ক'রে মাহিনার টাকা দুটি তিনি বাড়ীতে দিতে লাগলেন।

ঠাকুরদাসের এই চাকরিতে দুর্গাদেবী যেন হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ পেলেন। তিনি যে বিষম দুঃখ কষ্টে ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করছিলেন তা উপকথার গল্পের মত, বল্লে লোকে বিশ্বাস ক'রতে পারে না। কেবল ঈশ্বরের উপরে নির্ভর ক'রে ধার্ম্মিকা রমণী কোনমতে আধমরা হ'য়ে পৃথিবীতে সংসার পেতেছিলেন। সে অবস্থায় ঠাকুরদাস যে মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে, রোজগার ক'রে টাকা এনে সংসার চালাতে পারবে, তা তাঁর মনেও ছিল না। সুতরাং ঠাকুরদাসের এই দু'টাকা মাইনের চাকরিতেই যে তিনি হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাবেন—তার আর আশ্চর্য্য কি? তিনি যেন দেহে নূতন বল ফিরে পেলেন, জীবনে নূতন উৎসাহ এলো।

ভগবানকে ভক্তিভরে মনে মনে প্রণাম ক'রে—তাঁর উপর অকাট্য বিশ্বাস ও নির্ভর রেখে, তিনি সেই দুটি টাকা থেকেই গুছিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। এই রকমে দুঃখের সংসারে আবার সুখের দিনের সূচনা আরম্ভ হ'ল।

ক্রমে আটবৎসর কেটে যাবার পরে তাঁর স্বামী—ঠাকুরদাসের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী পিতা রামজয় তর্কভূষণ ম'শায় আবার গৃহে ফিরে এলেন। আটবৎসর সন্ন্যাসী ব্রত নিয়ে, গৃহত্যাগ ক'রে তীর্থে তীর্থে ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সিদ্ধ হয়ে, শেষ তিনি স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেয়ে আবার ঘরে ফিরে সংসার ক'রতে এলেন। এই ব্যাপারে দুর্গাদেবীর, ঠাকুরদাসের এবং অন্য অন্য ছেলেমেয়েগুলির যে কি আনন্দ হ'ল তা আর লিখে জানাবার নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্ম

ঠাকুরদাসের মাহিনা কম হ'ল বটে, কিন্তু সেই উপলক্ষ্যেই তাঁর সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী ফিরে এলো। তিনি এমন যত্নে মন দিয়ে আপনার ভেবে কায ক'রতে লাগলেন যে মনিব তাঁর যত্ন পরিশ্রম, মনেযোগ আগ্রহ এবং সৎ-স্বভাবের পরিচয় পেয়ে বড় খুসী হ'লেন, সুতরাং ভাগবত বাবুরও আনন্দের সীমা রইল না, তিনি ঠাকুরদাসকে নিজের আত্মীয়ের মত যত্ন আদর ক'রতে লাগলেন এবং নিজেকে তাঁর উন্নতির কারণ মনে ক'রে ধন্য জ্ঞান করলেন। ঠাকুরদাস যখন যে মনিবের কাছে চাকরি ক'রতে

লাগলেন—তিনিই তাঁকে স্বভাবগুণে স্নেহ যত্ন ক'রতে লাগলেন। এই রকমে দিন কাট্‌তে লাগলো।

এ দিকে ঠাকুরদাসের সন্ন্যাসী পিতা ফিরে এসে গৃহবাসী হয়ে মনে ভাবলেন যে—"ভগবান যখন স্বপ্নে তাঁকে ঘরে ফিরে সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে আদেশ করেছেন, তখন তাঁর সংসারে ভগবানের কোন রকম দরকার আছে, নইলে তিনি তাঁকে আবার সংসারে ফিরে যেতে আদেশ করতেন না। কিন্তু তাঁর মত গরীব ব্রাহ্মণের সংসারের ভিতর দিয়ে জগদীশ্বর যে তার কি কার্য্য সাধন করবেন, তা তিনি তখন বুঝতে না পারলেও, স্বপ্নের আদেশ ভেবে সংসার ধর্ম্মে মন দিলেন। বড় ছেলে ঠাকুরদাসের বিবাহ দেবার যোগাড় করতে লাগলেন।

সেই সময়ে 'গোঘাট' গ্রামের রামকান্ত তর্কবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সাধক-ভজনায় খুব সিদ্ধ হয়েছিলেন। ঠকুরদাসের পিতা তর্কভূষণ ম'শাই তাঁকে ভাল রকম জানতেন। তাঁর দুটি মেয়ে ছিল, বড়-টির নাম লক্ষ্মী ও ছোটটির নাম ভগবতী। রামকান্ত তকবাগীশ মশাই শেষে শব-সাধনা করতে করতে পাগল হয়ে যান। তখন তাঁর স্ত্রী গঙ্গা দেবী পাগল স্বামীকে আর মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী 'পাতুল' গ্রামে গিয়ে থাকেন। লক্ষ্মী ও ভগবতী মেয়ে দুটি ছেলেবেলা থেকেই মামার বাড়ীতে মানুষ হতে লাগলেন।

লক্ষ্মী ও ভগবতীর বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ বড় ধার্ম্মিক লোক। ব্রাহ্মণের যা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করা উচিত, তিনি সে সকল প্রাণ ঢেলে করতেন। দেবতার পূজা, অতিথির সেবা, দান ধ্যান, যাগ যজ্ঞ এই সব কায তাঁর সংসারের নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁর বাড়ীতে সদাব্রত—যে আসতো, সেই পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে যেত, কেউ কখনো তাঁর বাড়ীতে এসে, হাত পেতে, নিরাশ হয়ে ফিরতো না। লক্ষ্মী ও ভগবতী ছেলেবেলা

থেকে সেই সকল দেখে দেখে নিজেরাও সেই রকম শিখলেন, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত লোকজনকে অকাতরে অন্নদান করা তাঁদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ালো। রামজয় তর্কভূষণ মশাই এই ভগবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর ছেলে ঠাকুরদাসের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করলেন। ঠাকুরদাসের বয়স যখন তেইশ চাব্বিশ বৎসর তখন ভগবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল।

রামজয় তর্কভূষণ মশাই বনমালীপুরের বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবী ছেলেমেয়েগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সেই যে বনমালীপুরের বাস তুলে বীরসিংহ গ্রামে এসেছিলেন, তর্কভূষণ মশাই আবার সংসারে ফিরে এসে সেই বীরসিংহেই রইলেন—বনমালীপুরে গেলেন না। সুতরাং বীরসিংহে থেকেই ঠাকুরদাসের বিবাহ হল।

দিন যায়। কালে ভগবতী দেবী গর্ভবতী হ'লেন, কিন্তু তখন আর এক বিপদ উপস্থিত হল। হঠাৎ একদিন তাঁর স্বভাবে কেমন একটু আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন দেখা গেল, সকলেই মনে মনে ভয় পেলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁদের ভয় সত্য হয়ে দাড়ালো—ভগবতী দেবী পাগল হয়ে গেলেন। কি বলেন—কেউ বুঝতে পারে না, আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কি দেখেন, নিজের মনে বিড় বিড় করে বকেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারাও বদলে গেল, একটা আশ্চর্য্য রকম জ্যোতিঃ যেন তাঁর চারিদিকে ঘিরে ফেল্লে। দেখে শুনে সবাই মনে মনে বড় ভয় পেলেন। কেবল সিদ্ধ পুরুষ তর্কভূষণ মশাই যেন আনন্দিত হলেন।

তিনি দুর্গাদেবীকে বুঝিয়ে বল্লেন যে—"বউমার জন্য কোন ভয় নেই, আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তাতে শুভ লক্ষণই দেখছি, তোমরা কিছুমাত্র ভয় পেও না।"

কিন্তু সে কথায় দুর্গাদেবীর মন নিশ্চিন্ত হল না, তিনি স্বামীকে পীড়াপীড়ি করে ভগবতী দেবীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করালেন। নানা

রকম ঔষধপত্র খাওয়ানো হতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—ভগবতী দেবী দিন দিন আরো বেশী রকম পাগল হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। তখন দুর্গাদেবী বড়ই কান্নাকাটি সুরু করলেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে প'ড়ে তর্কভূষণ মশাই একজন খুব ভাল জ্যোতিষী এনে ভগবতী দেবীর কোষ্ঠী গণনা করালেন।

সেই জ্যোতিষীর নাম ভবানন্দ শিরোমণি, তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোষ্ঠী দেখে শুনে বল্লেন—"তোমরা মিছে ভয় পেয়েছ, বৌ-মার কোন রকম ব্যারাম হয় নি, খুব সুস্থ আছেন—কোন রকম পীড়া হবেও না। কোন মহাপুরুষ এসে এঁর গর্ভে জন্মেছেন, তাঁর তেজ ইনি সহ্য করতে না পেরে এ রকম অধীর হয়ে পাগলের মত হয়ে পড়েছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হবা মাত্রেই ইনি সুস্থ হবেন।" জ্যোতিষী শিরোমণি মশায়ের কথা শুনে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। কেউ বা মনে মনে বিশ্বাস করলেন, কেউ বা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দুপুর বেলা ভগবতী দেবী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে—যেন কোন মন্ত্রবলে—তাঁর সমস্ত পাগলামী উড়ে গেল, তিনি সহজ মানুষের মত বেশ কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে শিরোমণি মশায়ের কোষ্ঠী গণনার কথা সকলের সত্য বলে মনে হল।

এ দিকে শিশু ভূমিষ্ঠ হতেই, তাঁর ঠাকুরদাদা সিদ্ধপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ মশাই শিশুর জিভের নীচে আলতা দিয়ে একটু কি লিখে দিলেন। তারপরে বাইরে এসে পুত্র ঠাকুরদাসকে বল্লেন—"ঠাকুরদাস আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। ভবিষ্যতে এর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, এ শিশু সকলকে জয় করবে। যথার্থ বীরের মত

নির্ভীক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাশক্তিশালী বীরপুরুষ হবে, অথচ এর দয়াগুণে সংসারে শান্তির ধারা বইবে। এর জন্মে আমার বংশের অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ হল—আমরা ধন্য হলেম। আমি নিজে এর দীক্ষা গুরু হলুম, নাম রাখলুম—ঈশ্বরচন্দ্র। এর অন্য নাম হবে না, অন্য গুরু গ্রহণ করবে না।”

হলোও তাই। ঠাকুরদাদার ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফল্লো। ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দুপুরবেলা বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী-দেবীর গর্ভে যে শিশু জন্মেছিলেন—তিনিই সেই মহাপুরুষ—দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শৈশব

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের পর থেকেই ঠাকুরদাসের মাহিনা বাড়লো, সংসারে সকল রকমে সকল দিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী নূতন হয়ে ফিরে এলো। এই সব কারণে ঈশ্বরচন্দ্র সকলেরই অত্যন্ত আদরের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌লেন। কাযেই, বেশী রকম আদর ও আস্কারা পেলে বালকেরা যেমন হয়ে থাকে ঈশ্বরচন্দ্রও তেমনি অত্যন্ত দুরন্ত ও একগুঁয়ে হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর জ্বালায় শুধু বাড়ীর লোক কেন, পাড়াপ্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত অস্থির হয়ে উঠ্‌লো।

তাঁর ঠাকুরদাদা রামজয় তর্কভূষণ যেমন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, আবার শরীরের শক্তি ও সাহসেও তেমনি সিদ্ধ ছিলেন। তিনি ভয় শব্দ জানতেন না, একটা লোহার দাণ্ডা হাতে নিয়ে যেখানে সেখানে নির্ভয়ে একেলা যেতেন। একবার মেদিনীপুরের পথে একটা ভালুকের সঙ্গে লড়াই করে নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়েও তাকে মেরে ফেলেছিলেন। নাতি

ঈশ্বরচন্দ্রও শৈশব থেকেই ঠাকুরদাদার সাহস শক্তি ও বীরত্ব যেন দখল করে বসেছিলেন। সেইটুকু বয়সে তেমন সাহস ও শক্তির কথা আর কারো শুনা যায় না। তার উপর একগুঁয়ে উর্ব্বর মস্তিষ্কের ভিতরে অষ্টপ্রহর দুষ্ট মতলব জাগছে, সুতরাং সে ছেলে যে গ্রাম মাথায় করবে তার আর আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরচন্দ্রের দৌরাত্ম্যে ও উপদ্রবে সকলেই ভারি বিব্রত হয়ে পড়লো। শেষে কতকটা শাসনে থাকবে ভেবে তাঁকে কালী-কান্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে দেওয়া হল। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর।

ঈশ্বরচন্দ্র এদিকেও যেমন দুষ্টু ছিলেন, পড়াশুনাতেও তেমনি দুষ্টুমির পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি ভাবলেন—পড়াশুনাতে কাউকে তাঁর উপর টেক্কা মেরে যেতে দিবেন না। যা ভাবা—সেই কায। দেখতে দেখতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সব ছেলেকে পড়ায় হারিয়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি যখন প্রথম ভাগ পড়েন, তখন অন্য যে সব বড় ছেলে তাঁর চেয়ে ঢের বেশী পড়তো, তিনি নিজের চেষ্টা পরিশ্রম মনোযোগ ও প্রতিজ্ঞার বলে তাদেরও ছাড়িয়ে উপরে উঠ্‌লেন। দেখে শুনে সবাই তাক্ লেগে গেল। গুরুমশাই ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রাণের মত ভালবাসতে লাগলেন। তাঁর দুষ্টুমিও সঙ্গে সঙ্গে শতগুণে বেড়ে চল্লো।

বছরখানেক পাঠশালায় পড়ার পর ঈশ্বরচন্দ্রের কঠিন ব্যারাম হ'ল। প্রথমে জ্বর, তারপর পেটের অসুখ, শেষে পেট-জোড়া পীলে—দিন দিন রোগা ও দুর্ব্বল হতে লাগলেন। কাযেই পাঠশালা ছাড়তে হল। তাঁর মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মশাই বোন ও ভাগ্নেকে নিজের বাড়ী পাতুল গ্রামে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ছমাস মামার বাড়ী থেকে, আরাম হয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র আবার মায়ের সঙ্গে বীরসিংহে ফিরে এলেন।

তারপর আবার তাঁকে কালীকান্তের পাঠশালায় দেওয়া হল। এবার তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সেই পাঠশালে পড়লেন। পাঁচ ছয় বছর ধরে যে সব ছেলেরা সেই পাঠশালায় পড়ছিল, তিনি তিন বছরেই লেখাপড়ায় তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে উঠ্‌লেন। শুধু তাই নয়—সেখানে যতদূর শেখা হতে পারে—তা তিনি সমস্তই শিখে ফেল্লেন, সে পাঠশালে আর কিছু শেখবার বাকী রইলো না। তখন তাঁর বয়স আট বৎসর।

ঈশ্বরচন্দ্রের একটা বিষম ঝোঁক ছিল—সবার উপর টেক্কা দেব, তা কি লেখাপড়ায়, কি দুরন্তপনায়। সেই ঝোঁকের বশে পড়ে তিনি লেখাপড়ায় যেমন সবাইকে ছাড়িয়ে উঠলেন, দুরন্তপনাতেও সকলে তাঁর কাছে হার মানলে। তা ছাড়া, যেখানে সাহসের কায, যেখানে বীরত্বের কায, যেখানে শক্তির পরিচয়—সেখানে তিনি সকলের আগে কোমর বেঁধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতেন। বিষম দুরন্ত ও একগুঁয়ে হলেও একটা মহৎ গুণ সেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বভাবে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল, সেটি—গুরুজনে ভক্তি।

গুরুমশাইকে তিনি ঠিক যেন দেবতার মত ভাবতেন। যখন তিনি বিস্ময় ভক্তি মাখানো চোখে তাঁর পানে অবাক্ হয়ে চাইতেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্রের মনের ভাব মুখে চোখে ফুটে উঠ্‌ত, দেখলেই বুঝ্‌তে পারা যেত যে তিনি গুরুমশাইকে সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের উপরে ভাব্‌ছেন। তার আর এক প্রমাণ এই—গুরুমশাই যখন যা শিক্ষা দিতেন তিনি সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে অত্যন্ত মনোযোগ আর আগ্রহের সঙ্গে সেগুলি যেন এক এক করে গিলে ফেলতেন। কাযেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সমস্ত শেখা হয়ে যেত।

এই ব্যাপার দেখে কালীকান্ত গুরুমশাই পাঠশালের ছুটীর পরে অন্য ছেলেদের বিদায় দিয়ে তাঁকে প্রায়ই কাছে রাখতেন। সেই সময়ে

মুখে মুখে যে সকল বিষয় শেখান দরকার, সেই সকল শিক্ষা দিতেন। দু'বার একবার শুনেই ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলি একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন—এমনি তাঁর আগ্রহ, এমনি তাঁর দৃঢ় মনোযোগ! তারপর রাত্রি হ'লে গুরুমশাই তাঁকে নিজে কোলে করে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

এই তিন বৎসর পাঠশালে পড়বার সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র নিজের হাতের লেখাও অতি সুন্দর করেছিলেন। তাঁর যখন জিদ যে সকল বিষয়ে সকলের উপরে টেক্কা দেব, তখন, হাতের লেখাতেই বা তিনি পিছিয়ে থাকবেন কেন?

এই রকমে আটবৎসর বয়সে যখন ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালের পড়া শেষ হল, তখন কালীকান্ত গুরুমশাই বল্লেন—"এখানে যা কিছু যতদূর শিখবার তা ঈশ্বরের হয়েছে, ওর স্মৃতিশক্তি যেমন প্রবল, ওর যেমন আগ্রহ আর মনোযোগ, ওর মনে যেমন সকলকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বার জিদ, তাতে ওকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরাজী শেখবার বন্দোবস্ত করা উচিত, এ বালক যা শিখবে—তাতেই মহা পণ্ডিত হবে।"

কিন্তু তখনই ঠাকুরদাস সদ্য সদ্য গুরুমশায়ের কথা মত ঈশ্বরকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে রাখবার কোন রকম বন্দোবস্ত করে উঠ্‌তে পারলেন না। কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতেই রইলেন।

দিনকতক পরে ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণ মশায়ের ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যু হল। সেই সময়ে শ্রাদ্ধশান্তি করবার জন্য ঠাকুর দাস বাড়ীতে এলেন। এবার আসবার সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখাবার বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে ঠাকুরদাস যখন আবার কলিকাতায় চল্লেন তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিলেন। কালীকান্ত গুরুমশাইও

সঙ্গে চল্লেন। আটবছরের ছেলে, মা ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, বাপের সঙ্গে বিদেশে যাচ্ছে, কাযেই ঈশ্বরচন্দ্রের মা, কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। ঈশ্বরচন্দ্রও এমনি মাতৃভক্ত যে মায়ের কান্না দেখে তাঁর চোখেও যেন সাগরের জল উছ্‌লে উঠ্‌লো। অনেক কান্না-কাটির পর মা ঠাণ্ডা হলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মেখে বাপের সঙ্গে যাত্রা করলেন। গ্রামের পথে যত দূর দেখা যায় তিনি কেবল ফিরে ফিরে মায়ের পানে চাইতে লাগলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পথে

বীরসিংহ হতে কলিকাতা ৫২ মাইল পথ। সেকালে রেল হয়নি, ঘোড়ার গাড়িও ছিল না, হয় নৌকা নয় হেঁটে আস্‌তে হত। কিন্তু নৌকাপথে বিপদ ঢের। প্রথমতঃ ঝড় তুফানের ভয়, তার উপর প্রায়ই চোর ডাকাত বোম্বেটের উপদ্রব হত। এই সব ভেবে চিন্তে ঠাকুরদাস পুত্রকে নিয়ে হাঁটাপথে যাওয়াই স্থির করেছিলেন। তিনি, কালীকান্ত গুরুমশাই, আর বাড়ীর পুরানো চাকর শ্রীরাম এই তিনজন ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে হাঁটাপথে কলিকাতায় রওনা হলেন।

পথে তাঁদের তিন দিন লাগলো। ঈশ্বরচন্দ্র বেশীর ভাগ পথ হেঁটেই চল্লেন, মাঝে মাঝে খানিক খানিক শ্রীরাম তাঁকে কাঁধে নিয়ে চল্লো। এই রকমে বরাবর এসে তাঁরা সিয়াখালার কাছে সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠলেন! এই রাস্তায় এসে একটা ব্যাপার দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের বড় কৌতূহল হল।

রাস্তার ধারে ধারে, এক এক মাইল দূরে দূরে এক একখানি পাথর বসান—আর তাতে কি সব আঁচড় কাটা। দু'একটা দেখবার পর তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বাপকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ বাবা, রাস্তার ধারে ধারে এক এক খানা বাটনাবাটা শিলের মত ওগুলো কি পোঁতা রয়েছে, আর ওতে ওই কাল দাগ গুলোই বা কি?"

ঠাকুরদাস ছেলের কথা শুনে হেসে বল্লেন—"ওগুলো রাস্তার মাপ, ওকে "মাইল-ষ্টোন্" বলে। "মাইল" মানে—আধ ক্রোশ, আর "ষ্টোন" মানে—পাথর। ওটা ইংরাজী কথা। প্রতি আধ ক্রোশ পরে পরে একটি করে মাইল ষ্টোন পোঁতা আছে, আর সে পাথরটি কলিকাতা থেকে কত দূর তাও ইংরাজী অঙ্কে লেখা আছে। এটায় উনিশ লেখা রয়েছে—কলিকাতা এখান থেকে উনিশ মাইল অর্থাৎ বাংলা হিসাবে সাড়ে নয় ক্রোশ।" এই বলে তিনি পাথরখানি আর তাতে লেখা ইংরাজী অঙ্ক ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখালেন। ঈশ্বরচন্দ্র অমনি মনে মনে বাংলা অঙ্কের হিসাব করে সেই ইংরাজী অঙ্কের উপর আঙ্গুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করেলেন—"তবে এইটে কি ইংরাজীর এক আর এইটে নয়?" ঠাকুরদাস বল্লেন—"ঠিক বলেছ, ওটা এক আর ওটা ইংরাজী নয়।" তার পর সকলে আবার চল্লেন, কিন্তু সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাইল-ষ্টোন গুলি বিশেষ করে দেখে তার অঙ্কগুলি বেশ করে লক্ষ্য করতে করতে চল্লেন।

৯ মাইল পথ আসার পরে আবার একটি মাইল-ষ্টোন—তাতে ইংরাজীতে ১০ লেখা। সেইখানে এসেই ঈশ্বরচন্দ্র থাম্‌লেন, বল্লেন—"বাবা, ইংরাজী অঙ্কগুলি শিখেছি, এক থেকে দশ পর্য্যন্ত ঠিক চিনেছি।"

ছেলেকে পরীক্ষা করবার জন্য ঠাকুরদাস পথ চলতে চলতে ক্রমে ৯, ৮, ৭, নম্বরের মাইল-ষ্টোনগুলি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

সেগুলি কয়ের আঁক? ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক বল্লেন। ঠাকুরদাস ভাবলেন ঈশ্বর বুঝি পর পর হিসেব মত আন্দাজি ৯, ৮, ৭, বল্লে। তিনি ভাল করে পরীক্ষা করবেন ভাবলেন।

৬ অঙ্কের মাইল-ষ্টোনের কাছাকাছি এসে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে নানা কথাবার্ত্তা এবং গল্পে ভুলিয়ে ফেল্লেন, মাইল-ষ্টোনটি আর দেখতে দিলেন না, শীগ্‌গির সেখানটা ছাড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন।

তার পরে ৫ নম্বরের পাথরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং ঈশ্বরকে দেখিয়ে বল্লেন—"বলদেখি এটা ক' মাইল? তোমার হিসাব-মত কত হয়?"

ঈশ্বরচন্দ্র বেশ করে দেখে যেন আশ্চর্য্য হলেন, বল্লেন—"আমরা ৭ পর্য্যন্ত দেখে এসেছি, এটা ৬ ছয় হওয়া উচিত, কিন্তু দেখ বাবা, এটাতে ভুলে পাঁচ লিখে রেখেছে—এটা ইংরাজীর ৫ পাঁচ।"

ঈশ্বরের কথা শুনে ঠাকুরদাস বড় আনন্দিত হলেন, বল্লেন—"ঠিক বলেছ বাবা, তোমার ইংরাজী অঙ্ক শেখা হয়েছে। এটা পাঁচই বটে। তোমাকে পরখ করবার জন্য আমি ছয় নম্বরের পাথরখানি দেখতে দিইনি—গল্পে ভুলিয়ে রেখেছিলুম।"

কলকাতার পথে আসতে এই রকমে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরাজী অঙ্ক আপনা আপনি শিক্ষা হয়ে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়

ঠাকুরদাস ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনলেন—তখন তাঁর মাহিনা ছিল ৮৲ আট টাকা। ছেলেকে আনবার পর দু' টাকা বেড়ে ১০৲ দশ টাকা হল। তাঁরা বড়বাজারের সেই ভাগবত বাবুর বাড়ীতেই রইলেন। সে সময়ে ভাগবত বাবুর মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর ছেলে জগদ্দুর্লভ বাবু, ঠাকুরদাসকে 'কাকা' বলে ডাকতেন এবং গুরুজনের মতই শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন।

যে দিন তাঁরা কলিকাতায় এসে পৌঁছিলেন, তার পরদিন সকালে ঠাকুরদাস কতকগুলি ইংরেজী বিল নিয়ে ঠিক দিচ্ছিলেন, ঈশ্বর তাঁর কাছে বসে এক মনে দেখছিলেন। সেখানে জগদ্দুর্লভ বাবুও বসেছিলেন।

দু' একখানা বিল ঠিক দেওয়া দেখে, হঠাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বল্লেন—"বাবা, ও বিলগুলো আমিও ঠিক দিতে পারি।" বালকের কথা শুনে জগদ্দুর্লভ বাবু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"ঈশ্বর, তুমি কি ইংরাজী জান না কি?"

ঈশ্বরচন্দ্র আগের দিনের পথের মাইল-ষ্টোনের কথা বলে শেষে বল্লেন—"কাল পথে আসতে আসতে আমি ইংরাজী অঙ্ক শিখে ফেলেছি, ঠিক দেওয়ার কায বেশ করতে পারবো।"

ঠাকুরদাস ও জগদ্দুর্লভ বাবু বালকের কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে পরীক্ষা করবার জন্য—খানকতক বিল ঈশ্বচন্দ্রের হাতে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলি নির্ভুল রকমে ঠিক দিয়ে ফিরিয়ে

দিলেন। তাই দেখে জগদ্দুর্ল্লভ বাবু বালকের ভাল রকম লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থা করতে বল্লেন। ঠাকুরদাসের নিজের লেখাপড়া শেখবার বেশীরকম ইচ্ছা ছিল কিন্তু অর্থের অভাবে পারেন নি, তিনি বল্লেন— "আমি ঈশ্বরকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করে দেব ভাব্‌ছি।"

জগদ্দুর্ল্লভ বল্লেন—"আপনার আয় কম, কি করে হিন্দু কলেজে পড়াবেন ?"

ঠাকুরদাস বল্লেন—"ঈশ্বরের পড়বার জন্য মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে মাহিনা দেব, বাকী যা থাকে তাই বাড়ী পাঠাব।" কিন্তু কাযের গতিকে ঠিক তেমনটি ঘটে উঠলো না।"

তাঁদের বাসার কাছেই বড়বাজারে শিবচরণ মল্লিক নামে এক-জন খুব বড় মানুষ সুবর্ণবণিক ছিলেন, তাঁর বাড়ীর বাইরের ঘরে এক পাঠশালা ছিল—সেখানে স্বরূপচন্দ্র দাস গুরুমশাই পড়াতেন। সেই স্বরূপচন্দ্র গুরুমশাইও একজন ছেলে পড়াবার পাকা লোক। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সে পাঠশালার পড়াও সব শেষ করে ফেল্লেন। এইবারে তাঁকে কোন স্কুল কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে লেখাপড়া শিখাবেন ঠাকুরদাস সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করতে লাগলেন। এমন সময়ে—ফাল্গুন মাসের প্রথমেই—ঈশ্বরচন্দ্র রক্ত-অতিসার রোগে পড়লেন।

আট বছরের কচি ছেলে মা, ঠাকুরমা, ভাই বোন, ঘরবাড়ী ছেড়ে একলাটি বাপের সঙ্গে বিদেশে এসেছে, তার মনে বড়ই কষ্ট, রাতদিন মন ছটফট করে—কান্না পায়, কিন্তু জগদ্দুর্ল্লভ বাবুর পরিবারেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে এমন স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন, তাঁরা তাঁকে এমন যত্ন আদর করতেন, ভালবাসতেন যে ঈশ্বরচন্দ্র আর সে বিদেশকে

পরের বাড়ী ভাবতে পারলেন না, তিনি তাঁদের যত্ন আদর ভালবাসায় ভুলে গেলেন। বিশেষতঃ জগদ্দুর্ল্লভ বাবুর ছোট বোন রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর চোখের মণির মত করে ফেলেছিলেন। তাঁর স্নেহ যত্ন আদর ভালবাসার কথা ঈশ্বরচন্দ্র শতমুখে বলে শেষ করতে পারতেন না। জগদ্দুর্ল্লভ বাবু ঠাকুরদাসকে 'কাকা' বলে ডাকতেন বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে 'দাদা' বলতেন আর তাঁর বোন দুটির একটিকে বড় দিদি অন্যটিকে ছোটদিদি বলে ডাকতেন।

ফাল্গুন মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের রক্ত-অতিসার ব্যারাম হলে জগদ্দুর্ল্লভ বাবুর বোনেরা প্রাণ দিয়ে সেবা করতে লাগলেন, রাইমণির তো কথাই নাই। তাঁর নিজের ছেলে গোপালচন্দ্র ঈশ্বরের সমবয়সী। তাকে ফেলেও তিনি ঈশ্বরের কাছে থাকতেন। সেই পাড়ার দুর্গাদাস কবিরাজকে দিয়ে ঈশ্বরের চিকিৎসা করানো হতে লাগলো, কিন্তু ব্যারাম কমলো না—বরং দিন দিন আরো বাড়তে লাগলো। তাই দেখে সকলেই ভেবে অস্থির হলেন। এই খবর শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরমা পাগলের মত হয়ে নিজে কলিকাতার বাসায় এসে পড়লেন।

তিনি এসে দিনকতক থেকে চিকিৎসা করাতে লাগলেন, কিন্তু তাতেও কিছু ফল হলো না, তখন তিনি নাতিকে নিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্য দেশে চলে গেলেন।

বাড়ীতে গিয়েই কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যারাম খুব শীঘ্র সেরে গেল, তিনি দিন দিন বেশ সুস্থ হয়ে আবার নীরোগ হলেন। চৈত্র, বৈশাখ দু' মাস বাড়ীতে রেখে, জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে আবার সঙ্গে করে কলিকাতায় নিয়ে চল্লেন।

এবার যাবার সময় পথে ঈশ্বরচন্দ্র ও ঠাকুরদাস দুজনারই ভারি কষ্ট হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন তিনি বরাবর হেঁটে যেতে

পারবেন, সঙ্গে আর লোক নিতে হবে না। তাঁর কথামত ঠাকুরদাস কোন চাকরবাকর সঙ্গে নেন নি, বাপ বেটা দুজনেই চলেছিলেন।

কিন্তু কিছুদূর পথ এসে ঈশ্বরচন্দ্রের পা ফুলে গেল আর হাঁটবার শক্তি রইল না। ঠাকুরদাসের শরীরে তেমন বল ছিল না যে অতবড় ছেলেকে বরাবর কাঁধে পীঠে করে বয়ে নিয়ে যাবেন। তবু অতি কষ্টে একটু আধটু কোলে করে পথের মাঝে মাঝে বসে দাঁড়িয়ে, নানা জায়গায় একবেলা দু'বেলা বিশ্রাম করে কোন মতে বৈদ্যবাটী পর্য্যন্ত এসে শেষে সেখান থেকে নৌকা করে কলিকাতায় এসে পৌছুলেন।

এবার কলিকাতায় এলে সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাস ভাবলেন যে তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই মহা মহা পণ্ডিত হয়ে দেশ জোড়া নাম রেখে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত শিখে তেমনি পণ্ডিত হয়ে যদি পূর্ব্বপুরুষদের নাম রাখতে পারেন, তা হলেই ভাল হয়। তিনি অভাবে পড়ে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি—বাপ ঠাকুরদাদার নাম লোপ পেতে বসেছে। এই সময়ে ছেলে যদি পণ্ডিত হয়ে বাড়ীতে গিয়ে একটি টোল খুলে দেশবিদেশের লোককে বিদ্যাদান করতে পারে, তা হলেই সকল দিকে মানায় ভাল।

এই সকল ভেবে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরাজী ১৮২৯ খৃঃ অব্দের ১লা জুন তারিখে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন। তখন তাঁর বয়স ন' বৎসর মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে

এর পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র আর কখনো সংস্কৃত পড়েন নি। পাঠশালে পড়েই বাংলা ভাষায় এ রকম দখল জন্মেছিল যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে একেবারে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে নিলেন।

সেই শ্রেণীতে পড়াতেন হাসিসংয়ের গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, সকল ছেলেদেরই বিশেষ স্নেহযত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। কলেজে ভর্ত্তি হবার দিন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র আপনগুণে তাঁর সুনজরে পড়লেন। অত শৈশব থেকেই তাঁর স্বভাবের গোঁ, যে কোন বিষয়ে কাউকে টেক্কা মেরে যেতে দেব না। এখানেও সেই জিদ্ বজায় রেখে চলতে আরম্ভ করলেন। ছ'মাস পরে পরীক্ষা হল, তাতে তিনি সকলের উপরের হয়ে ৫৲ পাঁচ টাকা জলপান পেলেন।

স্কুল কলেজে ভর্ত্তি হয়ে ছ'মাসের মধ্যে সমস্ত পুরাণো ছেলেদের হটিয়ে, একজামিনে একেবারে প্রথম হয়ে জলপানি পাওয়া বড় যে সে কথা নয়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র সেই কায অনায়াসে করলেন। তাঁর লেখাপড়ায় আগ্রহ, চেষ্টা, মনোযোগ ও পরিশ্রম দেখে গঙ্গাধর পণ্ডিত মশাই তাঁকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশী ভালবাসতে লাগলেন, সর্ব্বদাই তাঁর উপর নজর রাখলেন এবং বইয়ের পড়া ছাড়াও ছুটীর সময়ে মুখে মুখে নানা রকম সংস্কৃত শ্লোক শিখাতে লাগলেন।

এদিকে কলেজে ভর্ত্তি করে দেবার পর থেকে তাঁর পিতা ঠাকুর-দাস রোজ সকালে নয়টার সময় বড়বাজারের বাসা থেকে নিজে সঙ্গে

ক'রে তাঁকে পটলডাঙ্গায় কলেজে পৌঁছে দিয়ে নিজের কর্ম্মে যেতেন, তারপর আবার বিকালে চা'রটার সময়ে নিজে এসে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যেতেন। কলেজে গঙ্গাধর পণ্ডিত মশাই সর্ব্বদা তাঁর উপর দৃষ্টি রাখতেন, তার উপর অন্যান্য পণ্ডিতেরাও তাঁর গুণ শুনে ও লেখাপড়ায় অনুরাগ দেখে তাঁর উপর নজর রাখতেন। এই সব কারণে তিনি বদ্ ছেলেদের সঙ্গে মেশবার সময় ও সুযোগ পাননি।

তা বলে কলেজের ছেলেদের হাতেও তাঁর নিস্তার ছিল না। তিনি ছেলেবেলায় দেখতে একরত্তি বামনের মত ছিলেন—মাথাটা মস্তবড়, তার উপর বিষম তোত্‌লা, তাড়াতাড়ি কোন কথা বলতে পারতেন না; তো—তো—তো—তো করতে করতে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠতো। এইতে ছেলেরা মজা পেলে। তাঁকে "বাঁটুল" বলে, "যশুরে কই" বলে ক্ষেপাত, তিনি অমনি রেগে চটে লাল হয়ে উঠ্‌তেন। তখন আরো মুস্কিল হত—কথা মুখ দিয়ে মোটেই বেরুতো না—কেবল মুখ চোখ ভয়ানক লাল হয়ে উঠতো আর মাথা নেড়ে একটা সঙের মত হয়ে পড়তেন। কাযেই তিনি যত রাগতেন, ছেলেরা মজা পেয়ে তাঁকে আরো রাগাত। তিনি এত ছোট ছিলেন যে রাস্তায় যখন ছাতি মাথায় দিয়ে কলেজে যেতেন তখন লোকে ভাবত—বুঝি ছাতাটাই চলে যাচ্ছে, তাঁকে ছাতার ভিতর থেকে মোটেই দেখা যেত না।

কলেজে ভর্ত্তি হবার দিন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র যা কিছু পড়ে আসতেন, বাসায় এসে বাপের কাছে আবার সে সকল পড়া আবকল বলতে হত, একটু এদিক ওদিক হলে আর তাঁর নিস্তার থাকতো না। তা ছাড়া দু'চারদিন পরে পরে সমস্ত পুরাণো পড়াগুলিও সেই ভাবে বলতে হত। তাতে একটি ভুল হলে কি একটা এদিক ওদিক হলে ঠাকুরদাস অমনি তা ধরে ফেলে তাঁকে বিষম শাসিত করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মনে

মনে বিশ্বাস হয়েছিল যে তাঁর পিতাও গঙ্গাধর পণ্ডিতের মত ব্যাকরণে খুব পণ্ডিত। কিন্তু আসল কথা—ঠাকুরদাস ছেলের পড়া শুনে শুনে ব্যাকরণে বিশেষ রকম শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বাড়ীতে এসে বাপের কাছে পড়া বলেই যে ঈশ্বরচন্দ্র নিষ্কৃতি পেতেন তা নয়। তিনি ন'বছরের ছেলে মানুষ হলে কি হয়—তাঁকে তাঁর বয়সের চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করতে হত। একদিন সে পরিশ্রমের ত্রুটি হলে ঠাকুরদাস তাঁকে মেরে পীঠের চামরা তুলে দিতেন।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে, সন্ধ্যার পর পড়তে বসে যদি তিনি ঢুলতেন কি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর ঠাকুরদাস কর্মস্থান থেকে ফিরে এসে দেখতেন যে আলো জ্বলছে, কিন্তু ছেলে পড়তে বসে ঘুমুচ্ছে, তা হলে সে দিন আর তার রক্ষা রাখতেন না। বাপের মারের ভয়ে বালক ঘুমের হাত এড়াবার জন্ম প্রদীপের তেল নিজের চোখে রগড়ে দিয়ে যাতনায় ছটফট করতে করতে ঘুম তাড়িয়ে পড়া করতেন।

এদিকে আবার শেষ রাত্রেই ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে জাগাতেন এবং মুখে মুখে অনেক দরকারী কথা, কবিতা, শ্লোক শিখাতেন। এই রকমে তিনি বাপের কাছ থেকে মুখে মুখে প্রায় চারশো শ্লোক শিখে ফেলেছিলেন। ওদিকে গঙ্গাধর পণ্ডিতমশাইও ছুটীর সময়ে মুখে মুখে শ্লোক শিখিয়ে তার অন্বয়, ব্যাখ্যা সমস্ত শিখিয়ে দিতেন। এই সব কারণে কলেজের পড়া ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্রের ঢের বেশী শিক্ষা লাভ হত।

ওদিকে যেমন পড়ার তাড়া—এদিকে আবার সংসারের নানা কায কর্ম্মের ভার তাঁরই উপরে। তাঁর শোবার জায়গা হল একটি ছোট বারাণ্ডায়—সেটি মোটে দু'হাত লম্বা আর হাত দেড়েক চওড়া। সমস্ত দিন রাত্রের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর তিনি ঘণ্টা কতেকের জন্ম সেইখানেই কষ্টে সৃষ্টে ঘুমুতেন। একদিন তাঁর ছোট ভাই শম্ভু সেইখানে

বিছানাতেই মলত্যাগ করে ফেলেন, কিন্তু মারের ভয়ে সে কথা কাউকে বলেন নি। ভোরে উঠে ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন যে বিছানা অপরিষ্কার আর তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ময়লা। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর বাকী রইলো না। কিন্তু তিনি বাপ মা গুরুজনকে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন ভাইবোনদেরও তেমনি ভালবাসতেন। পাছে কথাটা প্রকাশ হলে শম্ভুর উপর শাসন হয়, সেই ভয়ে তিনি ভোরে উঠেই সে সমস্ত ধুয়ে কেচে, স্নান করে পরিষ্কার করে ফেল্লেন, ঠাকুরদাসকে কিছুই জানতে দিলেন না।

এই রকম অবস্থায় থেকে এত করেও তিনি তিন বছর ব্যাকরণ শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রথম হয়ে রইলেন। অন্য কোন ছেলে হাজার চেষ্টা করেও তাঁর উপরে উঠতে পারলে না। উপরি উপরি দু'বছর পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়ে জলপানি পেলেন। কিন্তু তৃতীয় বছরের পরীক্ষার সময় একটা বিভ্রাট ঘটলো।

সে বছর একজন সাহেব তাঁদের পরীক্ষক হলেন। মুখে মুখে পরীক্ষা—ঈশ্বরচন্দ্র ভয়ানক তোত্‌লা। তিনি সমস্ত প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন সত্য, কিন্তু সাহেব ভাবলেন যে ছেলে এত তোতলা—তাড়াতাড়ি বলতে পারে না, সে প্রথম হবার উপযুক্ত নয়। শুধু তাই নয়, তোত্‌লামির দরুণ অনেক কথা, অনেক উচ্চারণ সাহেব ভাল রকম বুঝে উঠতেও পারলেন না। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের নম্বর কেটে নীচে নামিয়ে দিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন যে তিনি সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েও প্রথম হতে পারলেন না, অথচ যে প্রথম হল সে সমস্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারলে না—তবুও তাঁর উপরে উঠে গেল। এই কারণে কলেজের উপর তাঁর বড় রাগ হল, ঘৃণা হল। মনের দুঃখে, তিনি কলেজ ছেড়ে দিলেন, স্থির করলেন—আর কলকাতার স্কুলে পড়বেন না, দেশে গিয়ে সার্ব্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিখবেন।

ছেলেবেলা থেকে তাঁর জিদ—তাঁর প্রতিজ্ঞা যে, সকল বিষয়ে সকলের উপরে যাবেন, আর কেউ তাঁকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারবে না। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তিনি প্রাণপাত করছেন। কিন্তু যখন পেরেও অন্যায় উপায়ে হেরে গেলেন তখন তো তাঁর রাগ হবার কথাই। যদি তিনি যথার্থ ই নিজের দোষে নেমে যেতেন, সমস্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে না পারতেন, তা হলে নেমে গিয়ে তাঁর দুঃখ হ'ত না। কিন্তু এ রকম অন্যায় অবিচার তিনি সইতে পারলেন না—স্কুল ছেড়ে দিলেন। ঠাকুর-দাস অনেক বুঝালেন, তাঁর মন বুঝলো না। শেষে গঙ্গাধর পণ্ডিত মশাই এবং কালেজের আরো অনেক শিক্ষক মিলে তাঁকে দিন রাত ধরে অনেক করে বুঝিয়ে তাঁর সঙ্কল্প ফেরালেন।

কাযেই তাঁর আর দেশে গিয়ে সার্ব্বভৌমের টোলে সংস্কৃত পড়া ঘটলো না, সংস্কৃত কালেজেই রইলেন। এই তিন বছরের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ শ্রেণীর পড়া শেষ করে ফেল্লেন, এমন সংস্কৃত শিখলেন যে অনর্গল সংস্কৃতে স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কইতে পারতেন—কোথাও একটি মাত্র ভুল হত না, কিম্বা মুখে আটকাতো না। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।

দশম পরিচ্ছেদ

অধ্যবসায়

এগার বৎসর বয়সে ব্যাকরণ-শ্রেণীর সমস্ত পড়া শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে গেলেন। তখনকার সাহিত্যের পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মশাই কিছুতেই তাঁকে ভর্ত্তি করতে চাইলেন না।

তিনি বল্লেন "এই টুকু অল্প বয়সের একরত্তি ছেলে সাহিত্যের কি বুঝবে ?" তাতে ঈশ্বরচন্দ্রের ভারি অভিমান হল, তাঁর মুখের উপর বল্লেন— "আমাকে ঐ সাহিত্য বিষয়েই ভাল রকম পরীক্ষা করে নিন না কেন, পারি —নেবেন, না পারি—নেবেন না। নহলে আমাকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়।"

বালকের কথা শুনে তর্কালঙ্কার আশ্চর্য্য হলেন এবং পরীক্ষা করবার জন্য ভট্টিকাব্য থেকে কতকগুলো খুব কঠিন কঠিন কবিতার মানে করতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তার অন্বয় শুদ্ধ এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন যে সাহিত্য-শ্রেণীর পুরাণো বড় বড় ছেলেরাও তেমন চমৎকার ব্যাখ্যা করতে পারে নি। তাই দেখে তর্কালঙ্কার শুধু যে তাঁকে সাহিত্য-শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে নিলেন তা নয়, চিরকাল নিজের ছেলের মত স্নেহ সমাদর করতে লাগলেন। এই শ্রেণীতে তাঁর সমবয়সী ছেলে একটিও ছিল না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি যতগুলি ছেলে সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়তেন—সকলেই তাঁর চেয়ে ঢের বয়সে বড়।

ঈশ্বরচন্দ্রের এখানেও সেই প্রতিজ্ঞা, সেই জিদ, সেই ঝোঁক। এই সব বড় ভাল রকম লেখাপড়া শেখা ছেলেদের উপরে উঠ্‌তে হবে, নইলে তাঁর জীবন বৃথা! সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য তিনি খাটতে লাগলেন—দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। শুধু বাজে পরিশ্রম নয়—চেষ্টা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সঙ্গে পরিশ্রম। সে পরিশ্রম ও চেষ্টার পথে আবার বাধা কত!

সেই সময়ে তাঁর মেজ ভাই দীনবন্ধুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য ঠাকুরদাস কলকাতার বাসায় এনে রাখলেন। লোক বাড়লো, কাযেই ঝঞ্ঝাট বাড়লো। এই সময়ে ঠাকুরদাসেরও আবার এমন কাযের ঝঞ্ঝাট

পড়লো যে তাঁর আর অবসর রইলো না, সুতরাং বাজার হাট রান্না বাড়া প্রভৃতি সংসারের সকল কাজই ঈশ্বরচন্দ্রের ঘাড়ে চেপে পড়লো।

তাঁকে রোজ সকালে বাজারে গিয়ে জিনিষ পত্র কিনে এনে, কুটনো কুটে, বাটনা বেটে, জল তুলে এনে, ঘর ধুয়ে, কাঠ কেটে, উনুন ধরিয়ে তবে রাঁধতে হত। তার উপর রান্না ঘরটিকে একটি অন্ধকূপ বল্লেও হয়—জানালা ছিল না—ঝাঁকে ঝাঁকে আরসোলা বেড়াত। পাশেই দু'দুটো পায়খানা। সেকালের কলকাতার পায়খানা—নরককুণ্ড বিশেষ, সর্ব্বদাই সেখান থেকে কৃমিগুলো কিল কিল করে এসে রান্না ঘরে ঢুকতো। ঈশ্বরচন্দ্রকে অতি সাবধানে বারবার জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হত।

থালা বাসন বেশী ছিল না। রান্না শেষ করে, বাপ ভাই প্রভৃতিকে খাইয়ে, সে সব মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে তবে নিজে খেয়ে কালেজে যেতে পেতেন। তাই কি রোজ দুবেলা স্বচ্ছন্দ হ'ত—পেট ভরে জুটতো? গরীবের সংসার, তেমন গরীব কালেজের আর কোন ছেলে ছিল না। কোন দিন ভাত জুটতো কোন দিন জুটতো না। যখন জুটতো, তখনো সব দিন তিনি পেটভরে খেতে পেতেন না। যেদিন আবার পেট-ভরে জুটতো, সেদিন হয়ত তরকারির অভাবে তাঁকে কেবল নুন দিয়ে ভাত খেতে হত।

যেদিন মাছ তরকারি জুটতো, সেদিন মাছের ঝোল রেঁধে, একবেলা শুধু সেই ঝোল মেখে ভাত খেয়ে, অন্য বেলার জন্য মাছ ও তরকারিগুলি তুলে রেখে দিতেন। সন্ধ্যায় আবার সেই মাছগুলি পর-দিনের জন্য তুলে রেখে শুধু শুক্‌নো তরকারি দিয়ে খেতেন। পরদিন সেই মাছগুলির টক রেঁধে তাই দিয়ে কোন মতে ভাত খেতেন। এই রকমে একবেলার মত মাছ-তরকারি দিয়ে কোন রকমে হিসেব করে

ছু'দিন চালাতে হ'ত। তার উপর ঠাকুরদাসের কড়া হুকুম ছিল একটি ভাতও কেউ ফেলতে পারবে না—থালা ধুয়ে মুছে খেতে হবে। একটা ভাত নষ্ট করতে দেখলে তিনি অনর্থ বাধাতেন। তাই তরকারি অভাবে নুন দিয়ে শুধু ভাত পেট ভরে খেতে হত। তারপর আবার বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে তবে রান্না ঘর থেকে বেরোতে পারতেন। এই রকম—ছুবেলা রোজ এই রকম বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে ধুয়ে তাঁর আঙ্গুলের নখগুলি সমস্ত ক্ষয়ে গিয়েছিল।

এদিকে এত খাটু'ন ওদিকে আবার রাত জেগে পড়া, তার উপর রোজ শেষ রাত্রে উঠা—ঈশ্বরচন্দ্রের একটি মুহূর্ত্ত-সময়ও অবসর ছিল না। এম'ন করে, এত খেটেও তিনি নিজের জিদ বজায় রাখলেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেন। সাহিত্য-শ্রেণীর প্রথম বছরে "রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, রাঘব-পাণ্ডবীয়" প্রভৃতি শক্ত শক্ত বইয়ের পড়ায় সব চেয়ে ভাল হলেন, পরীক্ষায় সকলের উপরে হয়ে প্রথম পুরস্কার পেলেন। তারপর দ্বিতীয় বছরে, "মাঘ, ভারবী, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত" কাব্যগ্রন্থ সকল খুব ভাল রকম পড়ে একেবারে আগাগোড়া সকল বই মুখস্থ করে ফেললেন। শেষ পরীক্ষাতেও সকলকে হারিয়ে একেবারে সর্ব্বপ্রথম হ'লেন। কালেজ শুদ্ধ সকলে দেখে শুনে অবাক্ হয়ে গেল।

তার উপরে সংস্কৃত থেকে বাঙ্গালা—বাঙ্গালা থেকে সংস্কৃত তর্জ্জমা এবং রচনা করা তিনি চমৎকার শিখলেন। হাতের লেখা অতি সুন্দর, তাতে তাঁর অনুবাদ কিম্বা রচনায় কোথাও একটি মাত্র বাণান ভুল কিম্বা ব্যাকরণ দোষ কিম্বা জটিল ভাব থাকতো না। তিনি যখন যা কিছু পড়তেন, তা এমন মনোযোগ দিয়ে শিখতেন যে তার কমা, দাঁড়িটি পর্য্যন্ত মনের ভিতর গেঁথে থাকতো, কাযেই তাঁকে কোন বিষয়েই হটুতে

হত না। এই সমস্ত মুখস্থ রাখতে অভ্যাস করেছিলেন বলেই তিনি—সেই বারো বছর বয়েস থেকেই অনর্গল নির্ভুল সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলতে পারতেন।

রাত্রি ৯টার পর ঠাকুরদাস কর্ম্মস্থান থেকে বাসায় ফিরতেন। বাসায় এসে যদি দেখতেন যে দু'ভাইয়ে বসে পড়ছে, তা'হলে খুসী হতেন। কিন্তু সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সেই অত রাত্রেও যদি কোন দিন ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়তেন বা ঘুমে ঢুলতেন তা'হলে ঠাকুরদাস এমন মারতেন যে বাসার অন্য লোকেরা পর্য্যন্ত ছুটে এসে বালকদের রক্ষা করতে চেষ্টা করত। বাপের মারের ভয়েই ঈশ্বরচন্দ্র অত পরিশ্রমের পরেও—রাত্রে চোখে প্রদীপের তেল দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে পড়তেন। এই রকমে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম সকল পালন করতে করতে তাঁর বাল্য-জীবন কাটতে লাগলো।

বারো বৎসর বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পরম পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও রচনাতেও আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মালো। এই সময়ে ছুটীতে যখন তিনি মাঝে মাঝে দেশে যেতেন, তখন সেখানে কারো বাড়ীতে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাযে কোন কবিতা কি শ্লোক রচনা করবার দরকার হলে—বালক ঈশ্বরচন্দ্রই তা করে দিতেন। তেমন সুন্দর শ্লোক বা কবিতা বড় বড় পণ্ডিতেরাও লিখতে পারতেন না।

একবার এক বড় মানুষের বাড়ীতে এই রকম আদ্যশ্রাদ্ধের সময় ঈশ্বরচন্দ্র শ্লোক রচনা করে দিয়েছিলেন। বাড়ীওয়ালা সেই শ্লোক লিখে নানা দেশের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করলেন। দেশ দেশান্তর থেকে সব বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এলেন। সকলেই সেই শ্লোকের শতমুখে সুখ্যাতি করতে লাগলেন, এবং কোন্ মহাপণ্ডিত রচনা করেছেন জানতে চাইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে এনে

তাঁদের সাম্‌নে বল্লেন—"এই বালকই শ্লোক রচনা করেছে"—তখন সকলে আশ্চর্য্য হয়ে বাক্‌হীন হয়ে পড়লেন—তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের এমন পাণ্ডিত্য, কি অদ্ভুত ক্ষমতা! সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের নাম—"মহাপণ্ডিত"—বলে দেশবিদেশে প্রথম রাষ্ট্র হ'ল। সকলেই একবাক্যে বল্লেন—"ভবিষ্যতে এঁর সমান বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ভারতবর্ষে থাক্‌বে না।"

সাহিত্য-শ্রেণীর পড়া শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র পনের বছর বয়সে অলঙ্কার শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলেন। সেই শ্রেণীর পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মশাই "ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অলঙ্কার" তিন বিষয়েই সব চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। সেই শ্রেণীর পড়োরা সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ঢের বড়। বয়সে সব চেয়ে অনেক ছোট হলেও তিনি কাযে সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠলেন। এক বৎসরের মধ্যে "সাহিত্য-দর্পণ" "কাব্য-প্রকাশ" ও "রস-গঙ্গাধর" প্রভৃতি মস্ত শক্ত শক্ত বই শেষ করে বাৎসরিক পরীক্ষায় সকলের উপরে প্রথম স্থান দখল করে বসলেন।

একে বাসার পরিশ্রম তারপর এ রকম পড়ার খাটুনি. ঈশ্বর-চন্দ্র পরীক্ষার পরে ভয়ানক ব্যায়রামে পড়লেন—তাঁর রক্ত-ভেদ হতে লাগলো। কলকাতায় নানা ঔষধ খেয়েও সারলো না দেখে তিনি দেশে গেলেন। সেইখানে এক ব্রাহ্মণ ঘোলের সঙ্গে "ওল" সিদ্ধ মিশিয়ে খাইয়ে তাঁকে আরাম করলে। ভাল করে সেরে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে তিনি আবার কলকাতায় চলে এসে নিজের পরিশ্রম নিয়ে বসলেন। পাছে বেশীদিন দেশে বসে থাক্‌লে বাপের কষ্ট হয়, সেই ভয়ে তিনি অস্থির হয়ে উঠে-ছিলেন। বাপ-মাকে তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা বলে ভাবতেন, স্পষ্টই বলতেন—"যে বাপ-মা বুকের রক্ত ঢেলে সন্তান মানুষ করে, তাঁদের পূজা না করে অন্য কোন দেবতার পূজায় ধর্ম্ম হয় না।"

এবার কলকাতায় আসার পর একদিন বিকালে দিনবন্ধু বাজারে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন—বাসা চিনে আসতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং পাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করে বেড়িয়েছিলেন। শেষে তিনি অনেক করে পথে পথে খুঁজে নূতন বাজার থেকে ভাইকে নিয়ে আসেন। তিনি যেমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ছিলেন—তেমনি আবার ভাইবোনের উপর স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন।

শুধু তাই নয়—গুরুভক্তিও তাঁর তেমনি প্রবল ছিল। তিনি যখন যেমন অবস্থায় দেশে যেতেন, আগে গিয়ে কালীকান্ত গুরু-মশাইকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে আসতেন। গুরুমশাই বালকের এই রকম অকপট দৃঢ় গুরুভক্তি দেখে আনন্দে অধীর হয়ে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করতেন। তা ছাড়া দেশের ইতর ভদ্র সকলের সঙ্গেই মিষ্ট কথায় সরল বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে কপাটী খেলতেন, সমবয়সীদের নিয়ে কুস্তি করতেন, লাঠি খেলতেন এবং বড়দের কাছে মাথা হেঁট করে ভক্তি সম্মান করে চলতেন। এই সকলের জন্য দেশের সকলেই তাঁকে ভাল বাসতো, তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে যেত।

ঈশ্বরচন্দ্র তাস পাশা দাবা প্রভৃতি আলস্যের খেলাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, এবং সকলকে সে সব খেলতে মানা করতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের সুনাম চারিদিকে এমনি রাষ্ট্র হয়ে পড়লো, যে অনেক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু পড়া শেষ না করে অত অল্প বয়সে তিনি বিবাহ করতে রাজি হলেন না। শেষে যখন তাঁর বাপ বিবাহ করতে বললেন তখন আর "না" বলতে পারলেন না। দেবতার আদেশের মত তিনি বাপমায়ের আজ্ঞা পালন করলেন। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য নামে এক বনেদি বংশের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ'ল।

এই সময়ে নিয়ম ছিল যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদান্ত শেষ করে ছাত্রেরা স্মৃতি পড়ে পড়া শেষ করবে, এই স্মৃতি পড়া শেষ হলে যিনি "ল"কমিটির পরীক্ষা দিতে পারবেন—তিনি "জজ-পণ্ডিত" হবেন, অর্থাৎ তিনিই সকলের বড় পণ্ডিত হবেন। এই স্মৃতি-শাস্ত্র শেষ করে "ল"-কমিটির পরীক্ষায় পাস করা বড় সহজ কথা ছিল না। লোকে স্মৃতিতে পাশ করে তার পরেও তিন চার বছর কঠোর পরিশ্রম করে "দায়ভাগ" "মনুসংহিতা" "মিতাক্ষরা" প্রভৃতি বই পড়ে পরীক্ষা দিত। সে পরীক্ষাও আবার ভয়ানক শক্ত— দু'একজন পাশ হ'ত; অন্য সকলে ফেল হয়ে লেখাপড়া শেষ করে কাজকর্ম্মের চেষ্টা ক'রত।

ঈশ্বরচন্দ্র পনেরো বছর বয়সে "অলঙ্কার" পড়েছিলেন। সেই সময়েই ছ'মাস অলঙ্কার শাস্ত্র পড়বার পরেই কালেজের কর্ত্তার কাছে আবেদন করে তিনি স্মৃতি পড়বার হুকুম নিলেন, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিশাস্ত্র শেষ করে "ল"-কমিটির পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ছ'মাস পরে পরীক্ষা হল। তিনি "অলঙ্কার", "স্মৃতি" এবং "ল-কমিটির" পরীক্ষায় অনায়াসে পাশ করলেন—শুধু যেমন তেমন পাশ করা নয়—সকলের উপরে—প্রথম হলেন। একথা শুনে লোকে কেউ বিশ্বাস করলে না যে, ষোল সতেরো বছর বয়সের ছেলে অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রথম হয়েছে এবং স্মৃতিশাস্ত্র শেষ করে "ল-কমিটির" পরীক্ষায় সুন্দর-রূপে পাশ করেছে শেষ যখন তিনি পাশ হবার সার্টিফিকেট পেলেন—তখন সহর তোলপাড় হয়ে গেল, সকলেই অবাক্ হয়ে ভাবলে—"এ বালক মানুষ না দেবতা ?"

ঈশ্বরচন্দ্র "ল-কমিটীর" পরীক্ষায় পাশ হবার কিছুদিন পরে ত্রিপুরায় জজ-পণ্ডিতের পদ খালি হল, তিনি সেই চাকরির জন্য দরখাস্ত করলেন, তখন তাঁর বয়স ১৭ সতের বৎসর। তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর হল, এবং সেখানে চাকরিতে লাগবার জন্য চিঠি এলো, কিন্তু ঠাকুরদাস কিশোর-বয়স্ক পুত্রকে একেলা সেখানে পাঠাতে রাজী হলেন না— কাযেই ঈশ্বরচন্দ্র সে চাকরি ছেড়ে দিলেন।

তারপর আরও অন্যান্য সব পরীক্ষা দিয়ে শেষে উনিশ বছর বয়সে তিনি "বেদান্ত" শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলেন। তখনকার বেদান্তের পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। যে সব জায়গায় চিরকাল তাঁর নিজের সন্দেহ ছিল, এবং বেদান্তের যে সব কঠিন নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি কখনো নিজে বুঝতে পারেন নি, সেই সকল স্থানে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক এবং বিচার করে তিনি নিজে বুঝে নিতেন এবং বেদান্তের আসল নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখের পানে চেয়ে বলতেন—"তুমিই ঈশ্বর !"

তারপর তিনি বেদান্ত শেষ করে ন্যায় ও দর্শন পড়তে

লাগলেন এবং এক বৎসরে সে সব শেষ করে পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়ে ১০০৲ একশো টাকা পুরস্কার পেলেন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখে আরো ১০০৲ একশো টাকা পেলেন। তখন তাঁর সকল পড়া শেষ হ'ল।

এই রকম সকল বিষয়েই বরাবর সকলের উপরে প্রথম হওয়াতে তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পেলেন—তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

সেই সময়ে তাঁর মেজ ভাই দীনবন্ধুর বিবাহ দিয়ে ঠাকুরদাস ঋণী হয়ে পড়েন। ঋণ শোধ করবার জন্য তিনি বাসার খরচ কমাতে বাধ্য হলেন। একেতো গরীবের ঘরের সেই খাওয়া—তার আবার কমাবেন কি? তবুও কমাতে হ'ল। দুধ, মাছ, ডাল তরকারি প্রভৃতি কিছুকালের জন্য কেনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বিকালে জল-খাবারের জন্য আধ পয়সার ছোলা ভিজান থাকতো, আধ পয়সার বাতাসা এনে তাই দিয়ে পাঁচ ছয় জনের জলখাওয়া হ'ত। শুধু তাই নয়—সেই ছোলা থেকে বাঁচিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আবার কুমড়ার তরকারিতে দিতেন। সেই কুমড়ার তরকারি আর ভাত এই তখন তাঁদের জীবিকা। তার উপর বাসার রাঁধা বাড়া, বাজার করা, জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি তাঁর নিত্য কায। এই সব বজায় করেও তিনি সকল শ্রেণীতে সকল শাস্ত্রে প্রথম হয়ে একুশ বছরে পড়া শেষ করে "বিদ্যাসাগর" হলেন। এত পরিশ্রমেও কখনো একটি দিনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের মুখ মলিন হয়নি কিম্বা তাঁর উৎসাহ কমেনি—এই আশ্চর্য্য!

ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় যে দু'শো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই টাকায় ঠাকুরদাসের ঋণ অনেকটা শোধ হয়ে হালকা হয়ে গেল। যখন তিনি ন্যায় ও দর্শন শ্রেণীতে পড়েন, তখন দু'মাসের জন্য ব্যাকরণের

দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়েছিল। তিনি দু'মাস সেই কাষ করে ৮০৲ আশী টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকা বাপকে তীর্থ করবার জন্য দিলেন. ঠাকুরদাস মহা আহ্লাদিত হয়ে গয়া প্রভৃতি কাজ করে এলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের অবস্থা ঐ রকম শোচনীয়, তবুও বাল্যকাল থেকেই তাঁর হৃদয়ে দয়ার সমুদ্র উছলে উঠেছিল। তিনি প্রতি ক্লাশে পরীক্ষায় যা জলপানি পেতেন, তাই থেকে—যে বালকের কাপড় নেই দেখতেন—তাকে কাপড় কিনে দিতেন, অথচ নিজে গুণচটের মত মোটা কাপড় পরে থাকতেন। যে গরীব ছেলের ক্ষিদের মুখ শুকিয়ে গেছে—তাকে খাবার কিনে খাওয়াতেন, অথচ নিজে বাসায় এসে একখানি বাতাসা দুটি ছোলা কিম্বা দুটো চাল দাঁতে কেটে জল খেতেন। চিকিৎসা অভাবে যে ব্যায়রামে ভুগছে—পয়সা দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করাতেন। বাকী যা থাকতো তা জমিয়ে বাপের কথামত ভাল ভাল বই, পুথি কিনতেন। কেন না ঠাকুরদাসের প্রাণের ইচ্ছা যে, ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতে টোল খুলে অনাথ গরীব ছাত্রদের বিদ্যাদান করবেন।

পূজোর সময় যখন তিনি বাড়ী যেতেন, তখনও কাঙ্গাল গরীবদের কাপড় কিনে দিতেন। যখন আর পয়সা থাকতো না, তখন নিজের পরণের কাপড়খানি পর্যন্ত গরীবকে দিয়ে আপনি গামছা পরে ঘরে আসতেন। এই রকমে কাঙ্গাল গরীবের জন্য বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের করুণ প্রাণ কেঁদে উঠেছিল, তাই উপযুক্ত কালে বিদ্যাসাগর দয়ার সাগরে পরিণত হয়েছিলেন।

শুধু গরীব কাঙ্গালের দুঃখ কেন, আরও একটা বিষয় ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণে করুণার ধারা জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি শৈশবে যে সকল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতেন, তাদের একটি

মেয়ে বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হয়েছিল। একবার ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতে গিয়ে দেখেন সেই মেয়েটি ক্ষুধা তৃষ্ণায় মাটীতে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। সেদিন একাদশী—বৈশাখ মাস। বালিকা বিধবার দুঃখ দেখে তিনি কেঁদে ফেল্লেন, তাঁর প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে লাগলো—প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি কখন ভগবান দিন দেন, তবে এর একটা প্রতিকার করবেন।

তাঁর বেদান্ত-শাস্ত্রের পণ্ডিত শম্ভু-বাচস্পতি অতি বৃদ্ধ। স্ত্রী মারা গেলে সেই অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি আবার বিবাহ করেন। সে বিবাহে ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু বাচস্পতি মশাই তাঁর কথা না শুনে বিবাহ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর 'গুরু-মা'কে দেখবার জন্য জোর করিয়া বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে দেখে প্রণাম করে—তাঁর ভবিষ্যৎ ভেবে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। এর অল্পদিন পরেই বাচস্পতি মারা গেলেন—এ ঘটনা তাঁর বুকে শেলের মত বিঁধতে লাগলো। তিনি হিন্দুর ঘরের বালিকা-বিধবাদের দুঃখ দূর করবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-জীবন

সংস্কৃত পড়া শেষ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী ও হিন্দি শিখিতে ইচ্ছা করলেন—ইংরাজী তো বিশেষ দরকার। কিন্তু তখন আর উপার্জ্জন না করলে চলে না, শুধু বসে বসে পড়ার দিন গেছে। তাই তিনি উপার্জ্জন করতে করতে ঐ দুটি ভাষা শেখবার ইচ্ছা করলেন।

১২৪৮ সালে তিনি প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে হেড্-পণ্ডিতের কর্ম্ম নিলেন, মাহিনা হল ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। সুতরাং আর তিনি বুড়ো বাপকে পরিশ্রম করতে দিলেন না—তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময় তাঁর কলকাতার বাসায় অনেকগুলি আত্মীয় কুটুম্ব এসে জুটলেন। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁদের সকলকেই প্রতিপালন করতে লাগলেন। নিয়ম করলেন—সকলকেই পালা করে এক একদিন রাঁধতে হবে। তিনি নিজেও এ পালার মধ্যে পড়লেন—এবং নিয়মমত স্বহস্তে রাঁধতে লাগলেন।

তখন তাঁর চারদিকের কাযকর্ম্ম এত বেশী যে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেতেন না, তবুও তার মধ্যেই তিনি সুন্দর রকম হিন্দি ও ইংরাজী শিখে ফেল্লেন। লোকে দেখে শুনে অবাক হয়ে গেল।

সেই সময়ে 'কালনার' তারানাথ বাচস্পতি মশাইয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, তিনি একটি কর্ম্মের জন্য বিদ্যাসাগর মশাইকে ধরেন বিদ্যাসাগর মশাই প্রতিজ্ঞা করেন যে সুবিধা পেলেই তিনি তাঁকে একটি কর্ম্ম নিয়ে দেবেন। ঘটনাক্রমে তার কিছুদিন পরে সংস্কৃত কালেজে একটি ৮০৲ আশী টাকা মাইনের চাকরি খালি হল। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেই চাকরি দিলেন। একদিন পরে থেকেই সেই কাযে লাগতে হবে। বিদ্যাসাগর মশাই ভাবনায় পড়লেন।

তাঁরতো ৫০৲ টাকা মাইনের চাকরি রয়েছে, কিন্তু তারানাথ বাচস্পতির মহা অভাব—তাঁকেই সংস্কৃত কালেজের ৮০৲ আশী টাকার চাকরিটি করে দিতে হবে। কিন্তু তখন আর সময় নেই—কলকাতা থেকে কালনা ৫০ মাইল দূর—চিঠি লিখলে বাচস্পতি কখনই এসে জুটতে পারবেন না। ভেবে চিন্তে তিনি সেই রাত্রেই হেঁটে কালনা রওনা হলেন। এবং সারারাত অনবরত পথ হেঁটে ভোরে কালনা পৌছে,

তখনি বাচস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে আবার কলকাতায় রওনা হলেন। তারপর যথাসময়ে এসে পৌছে বাচস্পতিকে সেই চাকরিতে লাগিয়ে দিলেন। পরের উপকারের জন্য এ রকম আত্মত্যাগ কটা দেখতে পাওয়া যায়?

এই সময়ে তাঁর এক ভাইয়ের বিবাহ হ'ল। অবশ্য টাকা কড়ি খরচপত্র বিদ্যাসাগর মশাই সব যোগাড় করে দিলেন, কিন্তু নিজে যেতে পারলেন না—কলেজে ছুটী পেলেন না। এদিকে তাঁর মা, চিঠি লিখেছেন যে তাঁকে যেতেই হবে। সেই চিঠি পড়ে মাকে স্মরণ করে তিনি সমস্তরাত কেঁদে অস্থির হলেন। পরদিন সাহেবকে গিয়ে বল্লেন— "আমার ছুটী চাই, হয় ছুটী দাও, নয় কাযে জবাব দিলুম", সাহেব বাধ্য হয়ে ছুটী দিলেন, অমনি তিনি বাড়ী রওনা হলেন।

আষাঢ় মাস, পথে দামোদর নদী সমুদ্রের মত হয়ে ঢেউ তুলে চলেছে—সেই নদী পার হয়ে যেতে হবে, নৌকাও নেই! তিনি কি করেন, ওদিকে মাকে দেখবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। তিনি "মা মা" বলে সেই ভয়ঙ্কর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে পার হলেন, তারপর আবার পথ হেঁটে রাত্রে গিয়ে বাড়ী পৌছে আগে মায়ের পায়ের ধুলো নিলেন।

বছর কতক পরে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কায ছেড়ে সংস্কৃত কালেজের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হলেন, কিন্তু সে কাযে তিনি বেশী দিন ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে কর্ত্তাদের অনেক সময়ে বনিবনাও হত না। তিনি তেজস্বী, স্বাধীন, ন্যায়বান—যা ভাল, যা ন্যায্য তা মুখের উপর বলতেন, কাযেই গোলমাল হতে লাগলো।

একদিন তিনি কালেজের প্রিন্সিপাল 'কার' সাহেবের সঙ্গে একটা দরকারে দেখা করতে গেলেন। সাহেব তাঁর সুমুখে চুরুট

টানতে টানতে জুতো শুদ্ধ দু'পা টেবিলের উপর তুলে রেখে কথা কইলেন। তাতে তাঁর বড় অপমান বোধ হল, তিনি সাহেবকে শেখাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

একদিন সেই সাহেব দরকারে পড়ে তাঁর কাছে এলো, তিনিও অমনি সাহেবের সামনে দু'পা টেবিলের উপরে তুলে দিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করলেন। সাহেব মনে মনে চটে গিয়ে তাঁর নামে নালিশ করলে। উপর-ওয়ালারা তাঁর কৈফিয়ৎ চাইলেন, তিনিও সমস্ত কথা আগাগোড়া তাঁদের জানালেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা দেখে খুসী হলেন। তার কিছুদিন পরে সেক্রেটারীর সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি সে চাকরি ছেড়ে দিলেন। "ফোর্ট উইলিয়াম" কালেজ তখন তাঁকে ৮০৲ আশী টাকা মাইনে দিয়ে আবার নিলে।

কিছুদিন পরে ১২৫৬ সালের ৩০শে কার্ত্তিক তাঁর বড় ছেলে নারায়ণ চন্দ্রের জন্ম হল, পরের বছর ১২৫৭ সালে তিনি আবার সংস্কৃত কালেজে এলেন। এবার তাঁকে একেবারে প্রিন্সিপাল (অধ্যক্ষ) করে আনা হল। বছর কতক প্রিন্সিপালের পদ ছাড়াও তিনি আবার ইনিস্-পেক্টারের পদ পেলেন, মাহিনা হল ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা।

তিনি এমনি সাহসী, এমনি তেজস্বী, এমনি ন্যায়বান, যে যত বড় লোক হোক না কেন, কারো মুখের উপর সত্য কথা—উচিত কথা বলতে ভয় পেতেন না, জীবনে কারুকে খোসামোদি করে চলতেন না। চিরকাল মোটা কাপড় মোটা চাদর আর তালতলার চটী পায়ে দিতেন, সেই বেশেই সকল স্থানে যেতেন। লাট সাহেবের দরবারেও সেই বেশে তিনি যে সম্মান পেতেন, তা লাখ টাকার পোষাক পরা কোন রাজা উজীরও পাননি। লাট সাহেবের মুখের উপরেও তিনি স্পষ্ট কথা, সত্য কথা—উচিত কথা শুনিয়ে দিতেন।

একবার তিনি দু'জন বন্ধুর সঙ্গে যাদুঘর দেখতে গেলেন। বন্ধুদের ভাল পোষাক ছিল, গটগট করে চলে গেল, দরোয়ান বিদ্যা সাগরকে সামান্য উড়ে ভেবে আটকালে, জুতো খুলে যেতে বল্লে। তিনি ঘৃণায় চলে গেলেন, জীবনে আর কখনো সেখানে গেলেন না, কিন্তু তাঁর কথায় তারপর থেকে যাদুঘরে সকলের অবারিত দ্বার হয়ে গেল।

তিনি স্কুল কালেজের ছেলেদের নিজের ছেলের মত দেখতেন, সকলকেই প্রাণদিয়ে ভালবাসতেন, কোন মাষ্টারকে ছেলেদের গায়ে হাত তুলতে দিতেন না। তিনি সকলে ভাল রকম ইংরাজী না শিখলে দেশের লোকের উন্নতি হবে না বলে নিজের চেষ্টায় নানা জায়গায় স্কুল কালেজ করে সকলের লেখাপড়া শেখবার সুবিধা করে দিয়ে গেছেন। কলকাতার মেট্রপলিটেন কলেজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম কীর্ত্তি।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার সুবিধা তিনিই করে গেছেন। 'বিটন' সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কলকাতায় বিটন স্কুল করেন। তিনি নিজে তার সেক্রেটারী ছিলেন। সেই স্কুলে মেয়েদের শেখবার জন্য "বোধোদয়" লিখলেন। পুরস্কার বিতরণের সময় নিজে উপস্থিত থেকে মেয়েদের বই, খেলনা, পুতুল দিয়ে উৎসাহ দিতেন—একবার এক-ছড়া সোণার চিক পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই বিটন স্কুলই এখনকার—বেথুন কালেজ। তাছাড়া আরও অনেক দেশ বিদেশে তিনি মেয়ে-স্কুল স্থাপন করে গেছেন।

তখনকার কালে এত সহজে লেখাপড়া শেখবার উপায় ছিল না; পাঠ্য বই ছিল না বল্লেই হয়। তিনি সহস্র কাযে ব্যস্ত থেকেও নানা রকম পাঠ্য বই লিখে বাঙ্গালার লোকের লেখাপড়া শেখবার পথ সহজ করে, দিয়ে গেছেন। আমরা এখন যে বাঙ্গালা পড়ি ও লিখি তার সৃষ্টি-কর্ত্তাই বিদ্যাসাগর মশাই। এমন কি স্কুল পরিদর্শনে যেতে পথে পালকীর

মধ্যে কয়েক ঘণ্টার ভিতর "উপক্রমণিকা" লিখে ফেল্‌লেন। ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি লিখে লোকের সহজে সংস্কৃত শেখবার উপায় করে দেছেন।

তখন স্কুল কালেজে গ্রীষ্মের ছুটী ছিল না। সাহেবদের দেশের মত ছুটী হ'ত শীতকালে। তিনিই সাহেব সুবোদের বুঝিয়ে সুজিয়ে এদেশের স্কুল কালেজে শীতের ছুটীর বদলে গ্রীষ্মের ছুটীর ব্যবস্থা করে দিলেন, সেই থেকে এদেশে গ্রীষ্মের সময় স্কুল কালেজের ছুটী হয়।

তারপর বালিকা-বিধবাদের বিবাহ। বালিকা-বিধবাদের দুঃখ কষ্ট তাঁর প্রাণে শেলের মত বিঁধেছিল, এখন উপযুক্ত হয়ে তিনি তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর মত বিদ্বান ও পণ্ডিত দ্বিতীয় নেই, সকল শাস্ত্র তাঁর নখদর্পণের মধ্যে। তিনি আহার নিদ্রা ভুলে দিনরাত খেটে খেটে শাস্ত্র থেকে রাশি রাশি প্রমাণ খুঁজে বার কল্লেন যে হিন্দুর ঘরে বালিকা-বিধবাদের আবার বিবাহ দেওয়া যেতে পারে, এবং দিতে হবে, নইলে একরত্তি দুধের মেয়ে নিরাশ্রয়া অবলাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকবে না। তিনি সেই চেষ্টা করতে লাগলেন।

তখন মূর্খ সমাজ তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ালো। তাঁর সঙ্গে তর্কে, বিচারে বা শাস্ত্রে কোন পণ্ডিতই জিততে পারলেন না, তবু অন্ধ-বিশ্বাস আর সংস্কার বশে গোঁ ধরলে—তা করতে দেব না। তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বালিকাদের মুখ চেয়ে নিজে সে কাযে লাগলেন। তাঁর বড় ছেলের সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিয়ে দিলেন, তারপর নিজের খরচে নিজে চেষ্টা উদ্যোগ ও পরিশ্রম করে আরো কয়েকটি বিধবার বিবাহ দিয়ে দিলেন। এই কাযে তাঁর বিস্তর পরিশ্রম চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় হয়েছিল। একটা এই রকম বিধবা-বিয়ে দিতেই তাঁর ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

এ কায ছাড়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান যে কত ছিল তার সীমা সংখ্যা হয় না। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলাতে ব্যারিষ্টার হতে গিয়ে একবার দেনার দায়ে জেলে যেতে বসেছিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বেশী টাকা ছিল না, তবু তিনি ছ'হাজার টাকা ধার করে তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মাইকেল বিলাত থেকে এদেশে এলে পরও তিনি তাঁর জন্য ৪০০০৲ চার হাজার টাকা খরচ করেছিলেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মশাই দেখলেন যে একজন ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করে যাচ্ছেন, চোক দিয়ে জল পড়ছে। তিনি ব্রাহ্মণকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ বল্লে—"মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা ধার করেছিলুম, শুধতে পারিনি, সুদে আসলে প্রায় আড়াই হাজার হয়েছে, তিনি নালিশ করেছেন, কিন্তু আমার হাতে একটা পয়সাও সঙ্গতি নেই।" তিনি ব্রাহ্মণের কাছ থেকে মোকদ্দমার দিন, কোন ঘরে মোকদ্দমা সমস্ত খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। তারপর ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার দিনে আদালতে গিয়ে দেখে যে কে একজন মহাপুরুষ আদালতে এসে তার সমস্ত দেনার টাকা পাই পয়সা পর্য্যন্ত শোধ করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শত চেষ্টাতেও দাতার নাম জানতে পারলেন না। এই রকম দানই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পনেরো আনা।

দান করে, লোকের বিপদে সাহায্য করে, তিনি ঠকেছেনও অনেকবার, তবু গরীবের দুঃখ নিবারণে পেছু হটেননি। একবার পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ধার করে নিয়ে যান, কিন্তু জীবনে তিনি সে ধার শোধ করেননি, এমন কি বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা পর্য্যন্ত করেননি। আর একবার দুটি ভদ্রলোক এসে দায় জানিয়ে ৫০০৲ পাঁচশো টাকা ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাও পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মশায়ের মত জীবনে আর কখনো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেননি। তবু কি তিনি দানে ক্ষান্ত হতেন? কেঁদে এসে দায় জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে কেউ

কখনো খালি হাতে ফিরে যায় নি। নিত্য এমন দু'শো একশো যে কত দিয়েছেন তা বলা যায় না।

বিদ্যাসাগর মশাই যখনই দেশে যেতেন, তখনই কি ইতর, কি ভদ্র, কি ছোট, কি বড় সকল লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খবর নিতেন—কে কেমন আছে। সেই সময়ে যাদের অন্ন নেই তাদের অন্ন দিতেন, যাদের বস্ত্র নেই তাদের কাপড় দিতেন, যারা রোগে ভুগছে তাদের চিকিৎসা করাতেন। এই রকমে তিনি সমস্ত গাঁ খানির বাপ-মায়ের মত হয়ে উঠেছিলেন।

শুধু কি তাই? যখন তিনি কলকাতার মধ্যে একজন খুব মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত নামজাদা লোক হয়ে উঠলেন—এমন কি লাটসাহেবের দরবারে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ ফাঁক যেত না, সেই সময়েও ঘৃণা লজ্জা মান সম্ভ্রমের ভয় দূর করে অনাথের সেবা করতে ক্ষান্ত হতেন না। একদিন তিনি হেঁটে বাড়ী ফিরছেন, এমন সময় রাস্তার ধারে এক কাণ্ড দেখে চমকে দাঁড়ালেন। একটি ভিখারী মেয়ে মানুষ ওলাউঠায় পথে পড়ে মরছিল।

তার সর্ব্বাঙ্গে ময়লা—গায়ে মাছি ভন্ ভন্ করছে, দুর্গন্ধে রাস্তার লোক নাকে কাপড় গুঁজে তফাৎ দিয়ে সরে যাচ্ছে—মরণের আর দেরী নেই। এই ব্যাপার দেখে বিদ্যাসাগরের মন গলে গেল—দয়ার সাগরের প্রাণে কানায় কানায় দয়া উছলে উঠ্‌লো—তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঘৃণা লজ্জা প্রাণের ভয় সব ছেড়ে তিনি তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এ রকম একটি আধটি নয়—রাশি রাশি ঘটনা তাঁর প্রতিদিনের জীবনে ঘটতো। পরোপকারে তাঁর স্বজাতি বিজাতি, স্বদেশী বিদেশী, স্ত্রীপুরুষ, ইতর ভদ্র জ্ঞান ছিল না—সমস্ত মানুষই তাঁর পরম প্রেমের পাত্র ছিল। দেশে একবার সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাতে তিনি নানা জায়গায় অন্নসত্র খুলে লোকের প্রাণ দিয়েছিলেন।

কর্ম্ম-উপলক্ষে তিনি নানা দেশে ঘুরতেন। একবার বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে নামবা মাত্রেই একটি ছেলে এসে একটি পয়সা ভিক্ষা চাইলে।

তার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তার পর তার দুঃখের বিবরণ জানতে পেরে তিনি টাকা দিলেন। বালকের পক্ষে সেটা যেন আকাশ-কুসুম বোধ হল। কথায় কথায় সে জানিয়েছিল যে এক সঙ্গে চার আনা পয়সা পেলে সে দু'আনা তার মাকে দিবে, তাতে দুদিন তাদের সংসার চলবে। বাকি দু'আনার আম কিনে বেচবে, সেই ব্যবসার রোজকার লাভ থেকে সংসার চলবে আর তাহলে তাকে ভিক্ষা করতে হবে না। বালকের এই সৎ-উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি একটি টাকা দিলেন। বছর দুই তিন পরে আবার একবার বর্দ্ধমানে গিয়ে নামতেই একটি ছেলে এসে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে ধরলে যে তার দোকানে তাঁকে গিয়ে একটিবার বসতে হবে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁকে দোকানে নিয়ে যাবার জন্য বালক পীড়াপীড়ি করছে কেন? তখন বালক বল্লে যে সে সেই ছোকরা —তাকে তিনি একটা টাকা দিয়েছিলেন। তাই থেকে ব্যবসা করে ক্রমে ক্রমে সে এখন দোকান করে গুছিয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর মশাই ভারি খুসী হলেন।

এদিকে অত বড় পণ্ডিত, অমন দাতা, সমাজের মাথা, দেশ-জোড়া সুখ্যাতি মান-সম্ভ্রম, কিন্তু স্বভাব চিরকাল ছোট ছেলের মত সরল ও উদার ছিল। মানভূম জেলায় কর্ম্মাটাঁড়ে তাঁর একটি বাসা ছিল—কাযের গতিকে সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁকে থাকতে হত। সেই সময়ে সেখানকার যত কোল ভীল সাঁওতাল ছোট লোক তাদের সঙ্গে তিনি ছেলে মানুষের মত মিশে খেলা করতেন—সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়িয়ে খবর নিতেন, দুঃখ দূর করতেন। তারা তাঁকে এমন আপনার ভাবতো যে তাঁর জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারতো, তাঁর উপর তাদের এমন জোর চলতো যে, তারা জোর করে তাঁর কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে নিজেরা কাপড় বার করে নিত। তিনি এতে বড় আনন্দ পেতেন।

তাঁর মাকে তিনি কাশী নিয়ে যান। অনেক লোক খুব বেশী বিদ্বান হলে নাস্তিক হয়ে পড়েন, তাই তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য কাশীর

ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি বিশ্বেশ্বর মানেন তো?" তিনি বল্লেন—"আমি তোমাদের এই কাশী ও বিশ্বেশ্বর জানি না, আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার জনক জননী।" ব্রাহ্মণেরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে সাক্ষাৎ দেবতা বলে মনে করলেন—এমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ছেলে পৃথিবীতে আর জন্মেছে কি?

১২৭৭ সালে তাঁর মার কাশীতে মৃত্যু হল। একবছর পর্য্যন্ত তিনি হবিষ্য করেছিলেন এবং ছাতা মাথায় দেন নি।

নানা রকম বিশেষ কারণে তিনি একবার ছেলে নারায়ণচন্দ্রের উপর এমন চটে গেলেন যে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে উইলে বিষয় থেকে বঞ্চিত করলেন। কিন্তু তার ফটোগ্রাফ দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন এবং লুকিয়ে তার উন্নতির উপায় করতেন। শেষ ১২৯৫ সালের ৩০শে শ্রাবণ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল—সেই সময়ে ছেলেকে ক্ষমা করে স্ত্রীর মনোকষ্ট দূর করলেন। ১২৮২ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল—তিনি তাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে কর্ম্মাটাঁড়ে গিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে কতকটা শান্তি পেয়েছিলেন। সেই সময় থেকে বাপের শোক প্রাণে প্রাণে এমন লেগে-ছিল, যে তাঁর নিজের ভাঙ্গা শরীর আর জোড়া লাগলো না।

এর পূর্ব্বে ১২৭৩ সালের ২রা পৌষ বিদ্যাসাগর একবার গাড়ী উল্‌টে পড়ে গিয়েছিলেন, তাতে এমন আঘাত লেগেছিল যে অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলেন। সেই থেকেই ভিতরে ভিতরে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে সুরু হয়েছিল।

শেষ দশায় তিনি পেটের ব্যায়রামে বড় ভুগছিলেন। ১২৯৭ সাল থেকে সেই ব্যায়রাম ভারি বেড়ে উঠলো—৪ঠা শ্রাবণ তিনি বিছানা নিলেন। ১০ই শ্রাবণ থেকে তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো, শেষ ঐ দিন রাত ২টা আট মিনিটের সময় স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলে গেলেন।

মানুষের ঘরে জন্মেও যে চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে দেবতার মত হ'তে পারা যায়—তার প্রমাণ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

তিন-আনা সংস্করণ কল্পতরু গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ান
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। হাজি মহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেম্‌সেদ্‌জী টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্র লাল
২২। হেমচন্দ্র
২৩। ডেভিড্‌ হেয়ার্‌
২৪। রামতনু লাহিড়ী

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

পাটুয়াটুলী—ঢাকা।